য়. বারানোভা
ইয়ে. ভেলতিস্তোভ
তিয়াপা,
বরকা
আর রকেট

গুবরে
লাইকা
বেপরোয়া
বেলকা আর স্ত্রেলকা
কেলে আর তারকা

মার্তা বারানোভা
ইয়েভগেনি ভেলতিসতোভ

তিয়াপা, বরকা আর রকেট

ভবঘুরে কুকুর হয়ে উঠল বিখ্যাত তাদেরই কাহিনী

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
ছবি এঁকেছেন ইয়ে. মিগুনোভ
পৃষ্ঠায় ছবি এঁকেছেন ক. রতোভ

মলাটের দিকে তাকালে কী দেখা যাবে? সাধারণ একটা নল, তার ভেতরে ভরা হয়েছে ফিল্মের ছাঁট আর দু'শ বাক্স দেশালাই, আর খুবই সাধারণ একটা বেজাতে কুকুর। তিয়াপাকে যাত্রী করে যখন বরকা আর তার বন্ধু গেনা এই রকেটটি ছেড়েছিল, তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে তাদের ঐ বেজাত কুকুরটাই হয়ে দাঁড়াবে জগদ্বিখ্যাত মহাকাশযাত্রী 'বেপরোয়া'? আর ঘটল কিন্তু ঠিক তাই। অবিশ্যি তার আগে তিয়াপার ভাগ্যে জুটেছিল নানা অ্যাডভেঞ্চার। নিজের আদরের মনিব বরকাকে সে হারায়। হাজির হয় কুকুর প্রদর্শনীতে; আর একটু হলেই চিত্রজগতের তারকা হয়ে উঠত; নামের বদল হয় তিনবার — 'তিয়াপা' — 'খেঁকুরে' — 'বেপরোয়া'।

বরকা, গেনা — এরাও অবশ্য মহাকাশযাত্রী হবে। তের বছর বয়েস, কিন্তু এখনি তারা মহাকাশের পরিস্থিতির সঙ্গে পরীক্ষাধীন জন্তুর পরিচয় ঘটাতে ব্যস্ত; দুনিয়ায় প্রথম চন্দ্র যাত্রা নিয়ে তাদের খেলা; মহাজাগতিক ইনস্টিটিউটকে সাহায্য করে তারা; মহাজগত থেকে নতুন আবিষ্কার নিয়ে ব্রডকাস্ট করে স্কুলে ...

চিত্তাকর্ষক মজাদার এই বইখানি লেখা হয়েছে মহাজগতের নির্ভীক সন্ধানীদের উদ্দেশে। এ থেকে জানা যাবে, মহাজগতে পাঠাবার আগে যাত্রীদের নিয়ে কী নিখুঁত প্রস্তুতির কাজ চালান মহাজাগতিক ডাক্তারেরা, জানা যাবে, মহাকাশ জয়ে কী ভূমিকা নিয়েছে সাধারণ রাস্তার কুকুরেরা — বিশ্ববিখ্যাত লাইকা, বেলকা আর স্ত্রেলকা — এরাও ঐ গোত্রের; জানা যাবে প্রথম মহাকাশযাত্রী মানুষ ইউরি গাগারিন আর গের্মান তিতোভের জন্যে 'মহাজাগতিক' ছাড়পত্র জোগাড়ে কী সাহায্যই না এরা করেছে ডাক্তারদের।

М. БАРАНОВА, Е. ВЕЛТИСТОВ
ТЯПА, БОРЬКА И РАКЕТА

На языке бенгали

সূচী

উদ্বোধনীতে কাণ্ড

সারা শহরে ইস্তাহার পড়ল:

রবিবার বেলা বারোটায়
'জ্নানিয়ে' সিনেমা হলে
'মহাজগতে রেনা'
বৈজ্ঞানিক কল্প-চিত্রের
উদ্বোধনী প্রদর্শনী
অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত থাকবে
প্রধান ভূমিকা গ্রহণকারী
ব্যোমযাত্রী রেনা

সকাল থেকেই মাথা ধরে উঠল 'জ্নানিয়ে' সিনেমা হলের ক্যাশিয়ারের। টিকিট ঘরের গোল জানলাটার ভেতর দিয়ে কেবলি এগিয়ে আসে শক্ত করে মুঠো করা হাত, আর মুঠো খুলে ছড়িয়ে পড়ে টিকিটের পয়সা। পয়সার মালিকেরা ঘাড় উঁচিয়ে পায়ের আঙুলের ডগায় দাঁড়িয়ে উঁকি দেবার চেষ্টা করে টিকিট ঘরে। পয়সা গুণে নীল একখানা টিকিট কেটে দেওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তারা। এক ঘণ্টা বাদেই ক্যাশিয়ার-মেয়ে হাঁপ ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেলল; সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে দিলে: হাউস ফুল।

প্রেক্ষাঘর লোকে ভরপুর, প্রতীক্ষার গুঞ্জন উঠছে। একদল লোক ঘরে ঢুকে গেল মঞ্চের দিকে। পর্দার সামনে টেবল। টেবলের পেছনে বসেছেন অতিথিরা। প্রেক্ষাঘরের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে ক্যামেরাম্যান তার বন্ধু বিখ্যাত পরিচালকের কানে কানে বললে:

'অভিনন্দন জানাই। একটা সিটও খালি নেই।'

'কিন্তু কী রকম দর্শক সব দেখুন: কেবল পেনশনী বুড়ো আর বাচ্চা,' ফিস ফিস করে বললেন পরিচালক, 'খুঁত ধরতে ওস্তাদ সব।'

দর্শকরা হাততালি দিলে: সিনেমা হলের ম্যানেজারের পরণে কালো স্যুট, কোটের বুক পকেট থেকে বেরিয়ে আছে রুমালের শাদা কোণা; ফিল্মের রচয়িতাদের পরিচয় দিতে শুরু করলেন।

উঠে দাঁড়ালেন পরিচালক; একটু চুপ করে রইলেন তিনি; চারিদিক একেবারে স্তব্ধ হয়ে উঠল।

অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'কমরেডরা, আমার জীবনের জরুরী মুহূর্তগুলোতে আমার মনে পড়ে সেই বহুদিন আগের একটা ঘটনা: ক্রাসনায়া প্রেসনিয়া'য় দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম পতাকার দিকে: পতাকাটা লাল আর আমার বুকের ওপরেও একটা লাল টাই; সবে পাইওনিয়র দলে ভর্তি হয়েছি সেদিন। তারপর থেকে বহুদিন মনে হয়েছে: কী চমৎকার যে এই পতাকার নিচে আমার জীবন শুরু হল!

'আজকের দিনটা একটা সাধারণ রবিবার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের মাথার ওপরে, আমাদের সারা দেশের ওপরে পতপত করছে একটা আনন্দের পতাকা — এটা নতুন কালের পতাকা, মানুষের মহাজগৎ জয়ের পতাকা। এ পতাকা প্রথম তোলে প্রথম সোভিয়েত স্পুৎনিক। তাকে এখন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তৃতীয় স্পুৎনিক। বলা যায় না, ওজনে একটা 'ভল্‌গা' মোটর গাড়ির সমান ঐ বস্তুটি হয়ত ঠিক এই মুহূর্তেই আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, এই সিনেমা হলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ...'

সবারই মনের মধ্যে ভেসে উঠল একটা ছবি: দেয়ালগুলো পেরিয়ে রাস্তায় ছুটে চলেছে সবুজ হলদে নীল রঙের সব 'ভল্‌গা', আর কোথায় যেন অনেক উঁচুতে দিনের আলোয় অদৃশ্য এক মহাজাগতিক যন্ত্রযান অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে সবাইকে বেদম পিছনে ফেলে।

পরিচালক তারপর বললেন সেই স্বপ্নের কথা, নির্ভয় নক্ষত্রলোকের স্বপ্নকল্পনা ও বৈজ্ঞানিকদের কথা, যারা মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে অজ্ঞাত নভোপথে।

'আমাদের ফিল্মটাও একটা স্বপ্ন,' বললেন পরিচালক। 'আজ আমার খানিকটা দুঃখই হচ্ছে কারণ এ ফিল্মের আয়ু বেশি নয়। শিগগিরই, অতি শিগগিরই মানুষ যাত্রা করবে মহাজগতে, শুরু হবে অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্য সব অ্যাডভেঞ্চার... তবে খুবই আনন্দ হবে আমার যদি অন্তত একবারের জন্যেও কখনো আপনাদের "মহাজগতে রেনা" ফিল্মটির কথা মনে পড়ে। বুঝব, আমাদের মেহনত বৃথা যায়নি ...'

হাততালির জবাবে মাথা নুইয়ে পরিচালক তাঁর পাশের মেয়েটিকে কী যেন বললেন ফিসফিস করে, তারপর চেয়ার থেকে একটা ছোট হাতব্যাগ এগিয়ে দিলেন।

'আর এবার সার্কাসের শিল্পী সোফিয়া লেপ আপনাদের সঙ্গে ফিল্মের প্রধান নায়িকা মহাকাশযাত্রিণী রেনার পরিচয় করবেন।'

ঝলমলে কালো পোষাক পরা সোনালী চুল মেয়েটি দুই হাত পেছন দিকে রেখে এসে দাঁড়াল মঞ্চের সামনে।

'আল্লে হপ্!' জোর গলায় হুকুম দিলে মেয়েটি।

অমনি তার পিঠের দিক থেকে লাফ দিয়ে এসে কাঁধে বসল ছোট্ট একটা বাঁদরী, গায়ে তার আকাশে ওড়ার পোষাক।

দ্যাখো কাণ্ড! ইস্তাহারে যে ব্যোমযাত্রীর কথা ছিল, সবাই যার জন্যে অমন উন্মুখ হয়েছিল, সে তাহলে বেশ চুপটি করেই বসে ছিল ঐ হাতব্যাগটার মধ্যে!

উল্লাসের হিল্লোল বয়ে গেল ঘরের মধ্যে। অভিনন্দনে উৎসাহিত হয়ে রেনা তার মুখ থেকে চশমাটা খুলে ছুড়ে ফেলল মেঝের ওপর, ভেঙচাতে শুরু করল, দেখিয়ে দিল যে সে একটা বাঁদরের মতো বাঁদর — খাঁটি মারমোজেট।

দর্শকেরা চেঁচামেচি করে অনুমোদন জানাল তাদের, সিট ছেড়ে হৈহৈ করে সবাই উঠে এল মঞ্চের কাছে ফুর্তিবাজ অভিনেত্রীটিকে আর একটু কাছ থেকে দেখবার জন্যে। আর একেবারে শেষ সারি থেকে ছুটে এল একটি মাথায় বো বাঁধা মেয়ে, ডালিয়া ফুলের একটা তোড়া হাতে নিয়ে। মঞ্চের ওপর উঠে ফুলের তোড়াটা সে এগিয়ে দিল ট্রেনার মেয়েটির হাতে।

তাড়াতাড়ি করে বললে, 'আমাদের পাইওনিয়র দলের পক্ষ থেকে,' তারপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে দিল রেনার মাথায়।

আর মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে মেয়েটির চোখ: বাঁদরীটা তার বেণী ধরে দাঁত বার করে বিজয় গর্বে তাকিয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

দর্শকদের মধ্যে কে একবার হিহি করে হেসে উঠেই চুপ করে গেল। মঞ্চের ওপর যারা বসেছিল তাদের মুখ কিন্তু গম্ভীর। রেনা কামড়ে বসতে পারে মেয়েটিকে! ফিল্ম তোলার সময় তা কতবার হয়েছে। বেয়াড়া বাঁদরীটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কারো নাকে বা গালে কামড়ে দিয়েই সোজা উঠে বসেছে গাছে, মুখ ভ্যাংচাতে শুরু করেছে।

ক্যামেরাম্যান ও পরিচালকের আর নড়ন চড়ন নেই। কে জানে যদি ক্ষেপে ওঠে বাঁদরীটা।

'রেনা, ছেড়ে দে বলছি,' সোফিয়া লেপের শান্ত মৃদু গলা শোনা গেল, 'ছেড়ে দে রেনা, নাও, ছেড়ে দাও, সোনা আমার ...'

নিরীহের মতো চোখ মিটমিট করে রেনা তাকাল ট্রেনারের দিকে। তারপর হাই তুলল, ধীরে ধীরে মুঠো খুলে নিজের গা চুলকাল। মেয়েটা ছাড়া পেয়ে ছুটে পালিয়ে এল মঞ্চ থেকে।

অস্বস্তি লাগছিল অতিথিদের।

সিনেমা হলের ম্যানেজার সবাইকে চাঙ্গা করে বললেন:

'বন্ধুগণ, আজ আমাদের উদ্বোধন দিন। এই যে ফিল্মটি নিয়ে আমাদের মাননীয় অতিথিরা সারা বছর ধরে খেটেছেন তার প্রথম দর্শক আপনারা। এখুনি আলো নিভে যাবে, রকেটের সাহসী যাত্রীটির মধ্যে আপনারা চিনতে পারবেন এই বাঁদরীটিকেই। আশা করি দুষ্টু রেনাকে আপনারা উদারতা দেখিয়ে মাপ করে দেবেন।'

রেনার নাম উচ্চারণ করতেই তালিম-পাওয়া বাঁদরীটা ম্যানেজারের পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিলে। তারপর রুমাল নেড়ে একটা হাওয়াই চুমু পাঠাল দর্শকদের উদ্দেশে।

হেসে উঠল সবাই, অতিথিরা সরে গেলেন মঞ্চ থেকে।

আলো নিভল। লহরে লহরে ঝরে পড়ল সঙ্গীতের একটা অনভ্যস্ত ঝঙ্কার। অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল তারা। নিশ্চল হয়ে রয়েছে তারাগুলো। কেবল একটা ধাবমান ছোট্ট আলোর বিন্দুতে শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে মহাকাশের। তাড়াতাড়ি মাটিতে ফিরে আসছে রকেট। কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত বেজে উঠল বিপদ সংকেত। ব্যোমযানের ক্রু জানাল যে ব্যোমপোতটা গিয়ে পড়েছে বিপজ্জনক কিরণ সম্পাতের মধ্যে।

এই শঙ্কার মধ্যে ফিল্মটার শুরু। মনে হল যেন ঐ মহাকাশের নিস্তব্ধতাই বুঝি নেমে এসেছে হলের মধ্যে। স্টার্ট নেবার ময়দানে উৎকণ্ঠ হয়ে আছে ছুঁচলো নাক রকেট। আন্তর্গ্রহ যাত্রার স্টেশনে কেউ নেই। বৈজ্ঞানিকেরা কবে যে এই কিরণ সম্পাতের রহস্য ভেদ করে তা থেকে বাঁচাবার উপায় পাবে তারই প্রতীক্ষায় বিষণ্ণ হয়ে আছে তারকা-যাত্রীরা, যেন বাধ্য হয়ে নেমে পড়তে হয়েছে বিমানকে।

কিন্তু সারা পর্দা জুড়ে হেসে উঠল একটা পরিচিত মুখ। রেনা! মহাজগৎ সন্ধানে যাবে সে। পৃথিবী থেকে সংকেত পাওয়া মাত্র ট্রেনিং পাওয়া বাঁদরী যন্ত্রের হাতল চালিয়ে দেবে, বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পারবেন কেমন বোধ করছে সে।

তাহলেও ভয়ের কথা। বাঁদরী হলেও মায়া হয় বৈকি।

সংরক্ষণী পোষাক পরানো হয়েছে রেনাকে, কেবিনের মধ্যে বসানো হল, বেল্ট দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। মাথা ঘোরাচ্ছে রেনা, হেলমেটের কাচের মধ্য থেকে দাঁত দেখাচ্ছে, মুখ হাঁ করছে। বিদায় উপলক্ষে কিছু একটা বলতে চাইছে বুঝি?

'ঘেউ!' সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে শব্দ উঠল, 'ঘেউ, ঘেউ!'

সাউন্ড অপারেটর কিছু বুঝতে পারল না: সে কী, এ ডাক এল কোথা থেকে? সাউন্ড রেকর্ডিং'এর সময় তো কোনো কুকুর ছিল না কোথাও।

কিন্তু ডাকটা যেন আর থামতেই চায় না। এতক্ষণে সবাই বুঝতে পেরেছে ডাকটা পর্দা থেকে নয়। শিস দিতে লাগল দর্শকেরা, এদিক ওদিক চাইতে লাগল। সেই সঙ্গে একটা ছোট্ট শব্দও যাতে বাদ না যায় সেদিকেও কান খাড়া।

অন্ধকারে কে যেন ছুটে যাচ্ছিল প্যাসেজ দিয়ে, মৃদু স্বরে ধমকালে:

'যত সব নচ্ছারের দল! লুকিয়ে লুকিয়ে কুকুর নিয়ে এসেছে হলের মধ্যে!'

আলো জ্বলে উঠল; শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের এবার দেখা গেল।

সিটের সারির মধ্যে ডাকতে ডাকতে ছুটছে এক শাদা কুকুর, কুকুরের পেছনে গুঁড়ি মেরে ধাওয়া করেছে গেট-কীপার, গেট-কীপারের পেছন পেছন ছুটছে হতভম্ব একটা ছেলে আর ছেলেটার পিছনে দ্রুত পা চালিয়ে আসছেন ম্যানেজার।

সিটের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারিয়ে কুকুরটা মুহূর্তের জন্যে থামল। সঙ্গে সঙ্গে চারটে হাতে জাপটে ধরা হল তাকে। গেট-কীপার তাকে টানতে চায় নিজের দিকে, ছেলেটা উল্টো দিকে।

'কী হচ্ছে এ সব!' কাছে এসে গর্জন করলেন ম্যানেজার।

'এ... এ হল তিয়াপা,' কুকুরটাকে না ছেড়েই বললে ছেলেটা, 'আমি ভেবেছিলাম...'

'কী ভেবেছিলে সে সব জানতে চাই না। এক্ষুনি হল ছেড়ে বেরিয়ে যাও!' বেরিয়ে যাবার দরজাটা দেখিয়ে দিলেন ম্যানেজার।

কর্তার লাল মুখ দেখে গেট-কীপার কুকুরটাকে ছেড়ে দিলে। ছেলেটা খপ করে কুকুরটাকে নিয়ে ওভারকোটের তলে বুকের কাছে ধরে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। কুকুরটা ততক্ষণে শান্ত হয়ে উঠেছে একটা সাদা কুণ্ডলীর মতো।

পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল:

'আ মর, গবেট কোথাকার!'

ম্যানেজার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন কেদারায়, রুমাল দিয়ে কপালটা মুছলেন।

উদ্বোধনী প্রদর্শন চলতে থাকল।

পোড়ো জমিতে বিস্ফোরণ

সেই দিনই সন্ধ্যায় সিনেমা হলের পাশের দশতলা বাড়িটার বাসিন্দেরা এক অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণে চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাড়িটা শহরের একটা একটেরে জায়গায়: একেবারে শেষে। তার একদিকে সুন্দর রাস্তা, খুব অল্পদিন হল রাস্তাটা বসেছে, কিন্তু এর মধ্যেই সরু সরু গাছপালায় তা সেজে উঠেছে, ঝলমল করছে দোকানপাতির সাইনবোর্ড। কিন্তু বাড়িটার চওড়া ছাই রঙের পেছন দিকটায় কেবল

অবারিত মাঠ, ঘাসের মেঠো গন্ধের ঢেউ নিয়ে বাতাস আসত সেখান থেকে। মাঠের একেবারে এধারে গড়ে উঠেছিল গ্যারেজের একটা এলাকা আর অপর প্রান্তে শুরু হয়েছে বন। সেখানে ছোট্টো একটা গাঁ। চারিদিক থেকে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছে বাড়ি বানাবার উঁচু উঁচু ক্রেন।

পোড়ো জমিটা শিগগিরই অদৃশ্য হবে, তবে ইতিমধ্যে সেখানে বাচ্চাদের রাজত্ব।

তাই এই রবিবার সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় গ্যারেজগুলোর পেছনে কী যেন করছে তারা। সংখ্যায় অবিশ্যি দুজন। ওদের দৃঢ় ধারণা ছিল জানলায় জানলায় আলো আর বাজনা ভরা বাড়িখানা নিজের মনেই আছে, যেমন ওরা আছে তাদের নিজেদের মনে।

কিন্তু ভুল হয়েছিল ওদের। বাড়িটায় থাকত একটি মেয়ে ল্যুবকা কাজাকোভা, সবকিছুতেই ওর নাক গলান চাই। তার বড়ো বড়ো ধূসর চোখদুটো সব সময়েই হাট করে খোলা, যেন কী একটা ঘটনায় সে আগে থেকেই অবাক হয়ে আছে। যাই ঘটুক সবার আগে সেখানে গিয়ে সাধারণত হাজির হবেই ল্যুবকা; আজকেও সবজান্তা ল্যুবকা শেষের গ্যারেজটির পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিল, অন্ধকারে চোখ মেলে রেখেছিল। ক্ষণে ক্ষণে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল তার, টের পাচ্ছিল কী একটা ঘটবে।

ওদিকে অন্ধকারের মধ্যে ওখানে ছেলেদুটো — কে যে ওরা তা ল্যুবকা ঠাহর করতে পারলে না — ছেলেদুটো নলের মতো চেহারার একটা অদ্ভুত জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। নলটা লোহার, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, ও জায়গাটায় আগে কখনো কোনো নল তো ছিল না।
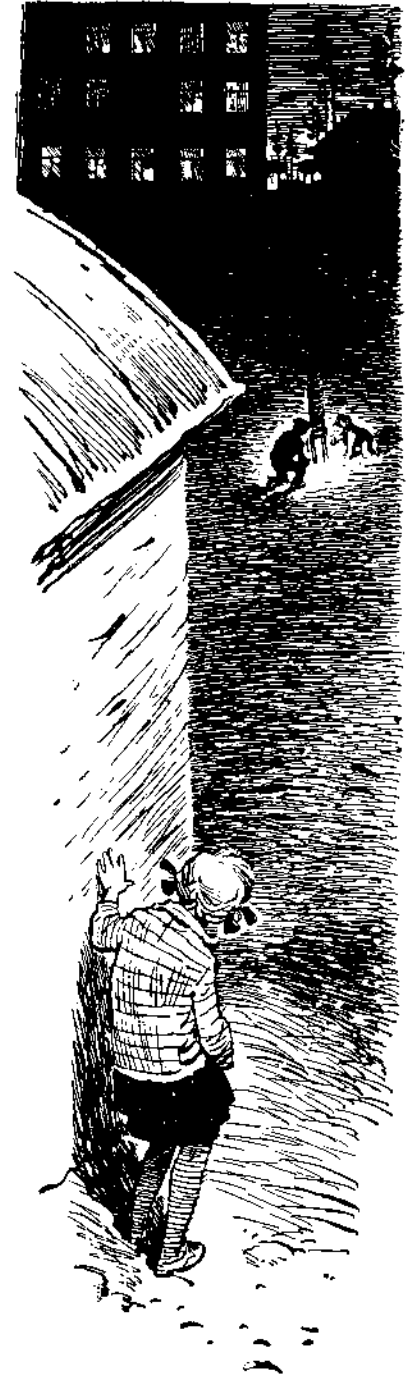
ল্যুবকার সতর্ক কানে আরো একটা জিনিস ধরা পড়ল: কেমন একটা কুকুরের ডাক। খুবই চাপা, কিন্তু শোনা যাচ্ছে। কোত্থেকে আসছে শব্দটা, নলটা থেকেই নয়ত?

ল্যুবকা ঠিক করলে ঐ গোপন সরঞ্জামটার কাছে আরো এগিয়ে যাবে। কোণটি ছেড়ে চুপি চুপি এগুতে গিয়েই থমকে পিছিয়ে গেল। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলতে দেখা গেল অন্ধকারে, তারপরেই ছেলেদুটো পড়িমরি ছুটে আসতে লাগল তারই দিকে।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। ক্ষুদে গোয়েন্দাটি বুঝল, এখন উধাও হওয়াই সবচেয়ে ভালো। গ্যারেজগুলোর মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে গলে সে ছুটল রাস্তার দিকে আর অল্পের জন্যে একটা 'ভলগা' মোটরগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেলে না। গাড়িটা আসছিল সামনের দিক থেকে। ড্রাইভার হুঁশিয়ারি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে হেড লাইট জ্বালিয়ে দিল। আলো এসে পড়ল একেবারে ল্যুবকার চোখে, চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ঠান্ডা দেয়ালটায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল কানফাটানো এক বিস্ফোরণ — গ্যারেজের পেছন থেকে ভয়ঙ্কর শিস দিয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল কী একটা গোলা। তার আগুনঝরা লেজের আলোয় আলো হয়ে উঠল পোড়ো জমিটা, আলো পড়ল মাথা তুলে চেয়ে থাকা উল্লসিত ছেলেদুটোর ওপর, ভয় পাওয়া মেয়েটি আর 'ভলগা' থেকে বার হয়ে আসা চওড়া-কাঁধ, টুপি মাথায় লোকটার ওপর। আলো কিন্তু ঝলসে উঠেই নিভে গেল। শিস বন্ধ হয়ে মাটিতে এসে পড়ল গোলাটা।

লোকটা ছেলেদুটোকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'কেরে, গেনা নাকি?'

ছেলেদুটো কিন্তু ততক্ষণে নলটার দিকে ছুটতে লেগেছে। তার মধ্যে থেকে তখন একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে কুকুরের।

'দাঁড়া তিয়াপা, এখুনি,' সান্ত্বনা দিল কুকুরের মালিক, অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছিল না, 'একটু দাঁড়া, বার করে আনছি তোকে।'

গরম নলটা থেকে কুকুরটাকে বার করার বহু চেষ্টাই করা হল, কিন্তু কিছু ফল হল না। ছ্যাঁকা খাওয়া বন্দিনীর কান্না আরো করুণ হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে এই করুণ পরিণতির জায়গাটায় এসে হাজির হয়েছে 'ভলগাটা'। গেনার বাপ নলটার কাছ থেকে ভাগিয়ে দিল ছেলেদুটোকে, ভয় দেখাল এর প্রতিফল শিগগির পাবে। গরম রকেটটা গাড়িতে তুলে নিয়ে রাখল সে, তারপর ধমকাতে ধমকাতে ঘ্যাঁচ করে ঘুরে স্পীড নিয়ে চলে গেল বনের দিকে।

রাস্তা থেকে হুইসিল শোনা গেল — দরোয়ান ঘুম ভেঙে মিলিশিয়াকে খবর দিয়েছে। ছেলেদুটো মুহূর্তের মধ্যে চুপসে গিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চম্পট দিল অন্ধকারের মধ্যে ...

দশতলা বাড়িটার প্রায় প্রত্যেকেই পোড়ো জমিতে আওয়াজ শুনেছিল, বিস্ফোরণের আগুন দেখেছিল। আন্দাজ করল এটা চল্লিশ ও একচল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটের 'উদ্ভাবকদের' কীর্তি, নিজেদের বানানো রকেট দিয়ে এরা বাসিন্দাদের কম ভয় খাওয়ায়নি। কেউ কেউ পাজিদুটোর পক্ষও নিলে, বললে ওদের টেকনিকে মাথা আছে। কিন্তু অধিকাংশ বাসিন্দেই এমন অপ্রত্যাশিত তামাসার বিরুদ্ধে মত দিলে; গৃহম্যানেজার শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের জরিমানা করার হুমকি দিচ্ছিল, তারই সমর্থন করলে।

গৃহম্যানেজার অবশ্য নিজের মনে আফশোস করলে যে তার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। দরোয়ান মিলিশিয়া ও গৃহম্যানেজার তল্লাস করে অপরাধের জায়গায় সামান্য পোড়া ঘাস আর ঝোপ ছাড়া কিছুই পেলে না।

"দস্যিগুলো কি সত্যি সত্যিই রকেট ছেড়েছিল?" গৃহম্যানেজার হতভম্ব হয়ে ভাবলে, "রকেট যদি কারো মাথায় এসে পড়ত তাহলে? না, বড়োই অনাচার... কিন্তু সাক্ষীও নেই..."

আর সাক্ষী ল্যুবকা কিন্তু কারো কাছেই কিছু ফাঁস করল না।

ফিরল না

দুই নম্বর গেটের সকলেরই এইটে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে প্রতি সকালে সেখানে পাঁচ তলায় একচল্লিশ নম্বরের দরজা খুলে যাবে আর বেরিয়ে আসবে একটা ঝাঁকড়া কুকুর আর লাল গেঞ্জি পরা একটা পাঁশুটে চুলো ছেলে। হুটোপুটি করে তারা নামবে সিঁড়ি দিয়ে আর কুকুরটার খুশির ডাক যার কানে যাবে সেই মনে মনে ভাববে সাড়ে সাতটা বাজল। কাজের লোকেরা যখন লিফটে করে নামতে থাকে, ততক্ষণে ছেলেটা আর কুকুরটা তরতরিয়ে ফের উঠে আসে নিজেদের

তলায়। সাধারণত তাদের সঙ্গে দেখা করতে ঐ পাঁচ তলার চত্বরেই চল্লিশ নং ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসত ঘুম চোখে একটি ছেলে, গায়ে তার স্ট্রাইপ দেওয়া স্লিপিং স্যুট, হাই তুলে জিজ্ঞেস করত, 'গুড মর্নিং! ক চক্কর দিলি? পাঁচ? চমৎকার!' তারপর কুকুরটাকে দু পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে চলে যেত স্লিপিং স্যুট পরা পড়শী ছেলেটি।

সোমবারে কিন্তু কুকুরের ডাক কেউ শুনলে না, যদিও লাল গেঞ্জি পরা বরকা স্মেলভ একচল্লিশ নং ফ্ল্যাট থেকে বরাবরের মতোই বেরিয়ে এল ঠিক সাড়ে সাতটায়। হালকা পায়ে স্লিপার পরে সে চুপি চুপি নেমে এল নিচে, তারপর বাড়িটার চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করলে। কয়েক চক্কর দিয়ে ব্যায়ামবীর ছুটে গেল পোড়ো জমিটার দিকে, ব্যায়াম করতে শুরু করলে।

কাজের লোকেরা বহু আগেই পা চালিয়েছে মেট্রোর দিকে, ইয়ারোস্লাভ ইভানভিচ স্মেলভ তাঁর সকালের শিফটের আগে শেষ কাপ চা খেয়ে শেষ করলেন, আর লাল গেঞ্জি পরা আমাদের ব্যায়ামবীর তখনো পোড়ো জমিটায় ফ্রিহ্যান্ড কসরত করে চলেছে।

'সত্যি কী হল বরকার? নাকি স্কুলে লেট হবার ইচ্ছে ওর?' পকেট ঘড়িটার দিকে চাইলেন ইয়ারোস্লাভ ইভানভিচ, 'তিয়াপাকেও কাল থেকে দেখা যাচ্ছে না। কুকুরটার কথা একবার বরকাকে জিজ্ঞেস কোরো তো গিন্নি।'

আলনা থেকে টুপিটা নিয়ে স্মেলভ চলে গেলেন কারখানায়।

বাপের পরিচিত মূর্তিটা মোড় নিতেই বরকা ছুটে এল বাড়িতে। চল্লিশ নম্বরের যে ফ্ল্যাটে থাকে তার বন্ধু গেনা কারাতভ, সেখান থেকে উঁকি দিলে না কেউ। এ দরজার ওপাশেও সেদিন সকালে যা শুরু হয়েছিল সেটা ঠিক দৈনন্দিনের মতো নয়।

সাংবাদিক আনাতোলি ইয়েভগেনিয়েভিচ কারাতভ সংবাদপত্রের দপ্তরে না গিয়ে সেদিন ঠিক করেছেন ছেলের সঙ্গে একটা সিরিয়স আলাপ করতে হবে। পিঠের দিকে হাত রেখে

তিনি পায়চারি করছিলেন ঘরের মধ্যে। হাত মুখ ধুয়ে টোরি কেটে ছেলে তখন প্রাতরাশ খাচ্ছিল টেবিলে বসে।

'এসব বাঁদরামি কবে বন্ধ হবে?' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন আনাতোলি ইয়েভগেনিয়েভিচ, 'প্রথমে মামুলী একটা পটকা, তারপর হৈচৈ করে টিনের কৌটোর একটা হাউই ছাড়া হল আর শেষ পর্যন্ত ঐ বেচারা কুকুরটাকে পুরে ঐ সাংঘাতিক টিউব। জরিমানা দিয়ে দিয়ে যে আমি হয়রান হয়ে গেলাম!'

'সমস্ত মহান বৈজ্ঞানিককেই কিছু না কিছু আত্মত্যাগ করতে হয়,' শান্তস্বরে উত্তর দিলে ছেলে।

'প্রথমত তুই মহান নোস। আর দ্বিতীয়ত, আত্মত্যাগের কথাই যখন তুললি,' আনাতোলি ইয়েভগেনিয়েভিচ পায়চারি থামিয়ে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন ছেলের দিকে, 'টিউবটার মধ্যে কী ভরেছিলি?'

একটু ইতস্তত করলে গেনা।

'ইয়ে আরকি, সিনেমা ফিল্মের ছাঁট; আর মানে দুশ বাক্স দেশলাই; মানে এমনি সব জিনিস। গুপ্ত পদ্ধতি, জানোই তো উদ্ভাবকেরা তা সব ফাঁস করে না।'

'খুব গুপ্ত পদ্ধতি ফলাচ্ছিস যা হোক। কিন্তু জানিস যে তোর গুপ্ত পদ্ধতি বহুকাল থেকেই কাজে লাগিয়েছে লোকে? আর খুবই শোচনীয় ফল হয়েছে তার? চীনা মান্দারিন হাউইয়ে করে কী ভাবে আকাশে উড়েছিল শুনেছিস?'

'চীনা মান্দারিন, হাউইয়ে করে?'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল গেনার। ও জানত যে বারুদ, কম্পাস, কাগজের মতো হাউই-ও উদ্ভাবন করেছিল প্রাচীন চীনা জ্ঞানীগুণীরা। জিনিসটা আগুনে বর্শা গোছের — বারুদভরা একটা নল উড়ে যেত শত্রুর দিকে।

কিন্তু হাউইয়ের ওপর সওয়ার হতে চেয়েছে এমন মান্দারিনের কথা সে কখনো শোনেনি।

'ভেবে দ্যাখ, চীন দেশে ছিল তেমন এক মান্দারিন বাং হু। বলতে গেলে তোর মতোই অনেকটা। সেও ভেবেছিল আতসবাজির হাউই দিয়ে আকাশে উড়বে। একটা বসবার জায়গা করলে বাং হু, তার সঙ্গে জুড়ে দিলে দুটো মস্ত ড্রাগন, যাতে আকাশে ভর দিতে পারে তাদের ওপর, তারপর এই উড়ন যন্ত্রটাতে ফিট করে দিল বহু হাউই।'

'সাবাস বুদ্ধি!' উল্লাসে চেয়ারের ওপরেই লাফিয়ে উঠল গেনা।

'অত খুশি হবার কিছু নেই। এ কাহিনীর শেষটা বড়োই করুণ। বাং হু ভেবেছিল হাউইগুলো একের পর এক ফাটবে, কিন্তু ফাটল সবই একসঙ্গে, সাতচল্লিশটি হাউয়ের সব কটিই! প্রাণ গেল বাং হু-র। এই হল তোর আতসবাজির গুপ্ত পদ্ধতি।'

'তাহলেও সাহসী লোক কিন্তু বাবা!'

'আঃ, খুব হয়েছে থাম,' আনাতোলি ইয়েভগেনিয়েভিচ হতাশায় হাত নাড়লেন, 'তোর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। আজ থেকে,' দৃঢ় গলায় জানিয়ে দিলেন, 'বাথরুমে তোর রসায়ন ল্যাবরেটরি যেন আর দেখতে না হয়। রকেট সম্পর্কে ঐ বইগুলো সব তালাবন্ধ। খুব কড়া রুটিনে চলতে হবে। ভালো কথা, দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট। দেখেছিস — শরীরচর্চায় ফের দুই নম্বর মাত্র। জিজ্ঞেস করি কেন? একচল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটে তোর বন্ধুটি রোজ সকালে ব্যায়াম করে আর তুই কেন কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকিস? তোর বন্ধু দ্যাখ তো কেমন দড়ির মতো পাকানো, আর তুই ন্যাতার মতো নরম?'

'মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো জিনিস তার বুদ্ধি,' খুব নিশ্চিত সুরে জানিয়ে দিয়ে গেনা তার প্লেটটা ঠেলে দিলে।

'খাসা! খাসা বলেছিস বটে... আর সিনেমা হলে কুকুর নিয়ে গিয়ে শো মাটি করার বুদ্ধিটা তোর ঐ বন্ধুর মাথায় কে ঢুকিয়েছিল শুনি, তুই না?'

'কিন্তু মহাজগতের পরিস্থিতির সঙ্গে পরীক্ষাধীন জন্তুর পরিচয় করিয়ে রাখা যে দরকার বাবা। দুর্ঘটনা ঘটবে কে জানত বলো। বেচারি তিয়াপা; বেশ ছ্যাঁকা খেয়েছে বোধ হয়।'

'বটেই তো: বিনা দোষে ভুগল কুকুরটা। আমি অবশ্য ভালো করে দেখতে পারিনি। বের করে আনতেই ছুটে পালাল। এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

'না ফিরে আসেনি তো। কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলে ওকে?'

'মানে তোর রকেটটা কোথায় পড়ে আছে জানতে চাস তো?' বাপ চোখ কোঁচকাল, 'ও চালাকিটা গেনা, খাটছে না। আর তাছাড়া তোর এখন স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে।'

স্কুলে গিয়ে যখন হাজির হল বরকা আর গেনা, তখন ঘণ্টা বাজছে। খাতাপত্র, কান দাঁত, প্রগ্রেস রিপোর্ট ইত্যাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজনের ওপর এক একটা ভার। ৬ 'ক' নম্বর ক্লাসে মহাশৃঙ্খলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সব অসংখ্য ভারপ্রাপ্তদের মধ্যে ল্যুবকা কাজাকোভার ওপর স্বাস্থ্য দেখার ভার। সেই কেবল ওদের হাত পরীক্ষা করে দেখলে অখণ্ড মনোযোগে, যেন সেখানে কী এক সাংকেতিক লিপি লেখা আছে। অন্য ভারপ্রাপ্তেরা আগেই ডেস্কে গিয়ে বসেছে। ক্লাসের মনিটর ল্যেভকা পমেরানচিক কেবল কিল দেখালে এই দুটি লেট লতিফের দিকে।

সাহিত্যের শিক্ষিকা 'শরৎ' কবিতাটির যে পড়া দিয়েছিলেন সেটা নিয়ে কিন্তু জিজ্ঞেস করলেন না (কালকের পরীক্ষকদ্বয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল), হুকুম দিলেন খাতা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে; বিষয়: বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কী পড়েছি।

বন্ধুত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেকেই বলতে পারে অনেক। কাগজে কাগজে ফুটে উঠতে লাগল রঙচঙে নানা মূর্তি। নীল লাইনটানা খাতায় কোথাও দেখা গেল ভেড়ার লোমের কালো আলখাল্লা পরা বীর চাপায়েভ, তার পেছনে কমিশার ক্লিচকভ, তার পেছনে বিশ্বস্ত এ্যাডজুটাণ্ট পেতকা। কোথাও ফুটল শত্রুর সম্মুখে তরুণ রক্ষীদের পতাকার নিচে নির্ভয় তরুণদলের সংহতি। কোথাও সমুদ্রে ধবধব করে উঠল জেলের ছেলে আর স্কুল ছাত্রের সেই অমল ধবল পাল। বেগুনী কালির ছিটের মধ্যে একটা খাতায় এমন কি কুঁজো ঘোড়ার পিঠে বোকা ইভানের রূপকথাটাও বাদ গেল না।

আর শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সারির মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলেন তাঁর ক্লাসের কথা। ভাবছিলেন, স্বভাবে একেবারে মিল নেই এমন ছেলেদের মধ্যে কী অটুট বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যেমন ঐ শেষের বেঞ্চির ছেলেদুটি। একজনের কলম চলছে তরতরিয়ে, লেখার ফাঁকে ফাঁকে হেসে এদিক ওদিক চাইছে, পাশের ছেলেকে গুঁতো দিচ্ছে। অন্য ছেলেটি ঘাড় গুঁজে লিখে চলেছে ভুরু কুঁচকে, প্রত্যেকটি শব্দ যেন ও মনের মধ্যে রসিয়ে নিচ্ছে।

"গেনা কারাতভ বেশ বুদ্ধিমান ছেলে," শিক্ষিকা ভাবলেন, "ছেলেরা ওর নাম দিয়েছে উদ্ভাবক, অঙ্কের মাস্টার খুবই তারিফ করেন ওর। ছেলেটা যত ন্যাকামিই করুক, মাঝে মাঝে বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক ৎসিওলকভস্কির অনুকরণে যখন ছেলেটা কানে না শোনার ভান করে তখনো সবই মাপ করে দেন তাকে।"

তাঁর কিন্তু বেশি ভালো লাগে চুপচাপ ঐ ছেলেটি বরকা স্মেলভকে। যদিও ও অবশ্য প্রায়ই তার আত্মবিশ্বাসী বন্ধুটির প্রাধান্য মেনে নেয়, তাহলেও তার এই সংযমের মধ্যে থেকে তার সবল একাগ্র স্বভাবের আভাস মেলে। শক্ত টানটান চটপটে ছেলেটি, দুরন্তপনায় সেও কম যায় না, কিন্তু চালাকি করে না, অন্য ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে লুকিয়ে থাকে না।

গেনা আর বরকাকে শিক্ষিকা ভালোই জানতেন, তবু তাদের রচনা পড়ে তাঁর অবাক লাগল। মার্ক টোয়েনের সেই বিখ্যাত গল্প হেকলবেরি ফিন আর টম সয়েরের বন্ধুত্বের বিষয়ে লিখেছে কারাতভ, তাদের স্বাবলম্বনের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে: "পারিবারিক অভিভাবকত্বে নিপীড়িত হয়েছে টম। অথচ পিসির কাছ থেকে টম যখন পালিয়ে গেল তখন তার আর বন্ধু হেকলবেরির জীবনে শুরু হল সব খাঁটি অ্যাডভেঞ্চার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হেকলবেরি ফিন আর টম সয়ের নিশ্চয় বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেছে, নিশ্চয় কোনো বিখ্যাত পরিব্রাজক বা ইঞ্জিনিয়র। অবশ্য বড়োরা যেমন কাউকে কাউকে বাধা দেয়, তেমন বাধা যদি তারা না পেয়ে থাকে।" এই 'কাউকে কাউকে' কারা, সে কথা রচনায় লেখা ছিল না।

আর গোটা সাহিত্যের মধ্যে থেকে বরকা বেছে নিয়েছে তুর্গেনেভের লেখা বোবা দরোয়ান গারাসিম আর কুকুর মুমু-র মধ্যে মর্মস্পর্শী বন্ধুত্বের গল্পটা: "আমি হলে কর্তার কথা শুনতাম না, কুকুরটাকে জলে ডুবিয়ে দিতাম না," বরিস লিখেছে, "সাধারণত কুকুরকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।" এই বলে সে আচমকা শেষ করেছে তার রচনা।

শিক্ষিকার মনে এ সন্দেহই হয়নি যে এই লাইনটা লেখার সময় লেখক এক ক্ষুধার্ত কুকুরের কথাই ভাবছিল, শরতের ঠান্ডা স্যাঁৎসেঁতে বনে যে এখন ঘুরে মরছে...

ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোড়ো জমিটার শেষ প্রান্তের এই বনে দুই বন্ধু সোজাসুজি বইয়ের ব্যাগ হাতেই এসে হাজির হল। বনের ধারটা তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু রকেটের কোনো চিহ্নই নেই।

মুহূর্তে দুজনেই চমকে উঠল: খাদের মধ্যে কী যেন নড়াচড়া করছে। ছুটে গিয়ে দেখে... ল্যবকা। উবু হয়ে বসে সে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে রকেটটার পোড়া দিকটায়।

'কী, হাত ময়লা কিনা দেখতে এসেছিস বুঝি এখানে,' খি'চিয়ে উঠল গেনা, আর বরকার পিছু পিছু লাফিয়ে নামল খাদটায়।

'নেই এর মধ্যে!' ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললে ল্যুবকা, গাছের ঝোপ ধরে খাদটা থেকে উঠে এল। তিয়াপার নাম না করলেও বরকা তখুনি বুঝল কার কথা বলছিল ল্যুবকা।

পাইপটা সত্যিই শূন্য। কিন্তু ঐ কালো টোলখাওয়া জিনিসটাই আকর্ষণ করল গেনাকে। খাদের তলায় বসে সে তখন হিসেব করছিল, পাইপটাকে ফের কাজে লাগানো যায় না কি। সেই মুহূর্তে চোখে পড়ল মাথার ওপরে ল্যুবকার হলদে জুতো। গেনা লাফিয়ে উঠল:

'এখনো পালাসনি? ভাগ এখান থেকে। নইলে দেখেছিস?' কিল দেখালে গেনা।

'অতো ভয় দেখাচ্ছিস কীসের,' সগর্বে বেণী ঝাঁকিয়ে বললে ল্যুবকা।

'তাড়াতাড়ি — জলদি!' জবরদস্ত হুকুম দিলে গেনা। (ল্যুবকা পিছিয়ে গেল।) 'কাউকে যদি একটা কথাও বলিস তো ভালো হবে না বলছি,' কারাতভ চে'চাল তার উদ্দেশে।

বরকা ওদিকে বনের মধ্যে ছুটল তিয়াপার সন্ধানে। প্রতিটি গহ্বরের মধ্যে উ'কি দিলে সে, কাঁটাভরা ফার গাছের মধ্যে দিয়ে বেপরোয়া হে'টে গেল, নাম ধরে ডাকলে, কান পেতে শুনলে ওই বুঝি সাড়া দেয় তিয়াপা...

একটা লম্বা বাদামী পাইন গাছের নিচে শাদা মতো কী একটা চোখে পড়ল বরকার, বুক ধক করে উঠল তার: ক্লান্ত হয়ে বেচারী কুকুরটা হয়ত বা শুয়ে আছে ওখানে। ছুটে গিয়ে সক্ষোভে পা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখলে একটা দলামোচড়া খবরের কাগজ।

কোথায় একটা ইঞ্জিনের শিস শোনা গেল: ওর মনে হল বুঝি একটা কুকুর ডাকছে। আরো জোরে হুইসিল দিল ইঞ্জিন; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে বরকা: না, ও নয়।

একটা ঝোপের মধ্যে থেকে মস্ত একটা ছেয়ে রঙের কুকুর ছুটে এল বরকার দিকে। কিন্তু তার দিকে দৃকপাত না করে একটা কাঠি কামড়ে ধরে নিঃশব্দে উধাও হয়ে গেল: কেউ হয়ত তার নিজের কুকুরটাকে ট্রেনিং দিচ্ছিল।

ছেলেটার ডাকে সারা বনের মধ্যে আর কেউ সাড়া দিল না। বড়ো কুকুরটা পর্যন্ত চুপ করে গেল। ইঞ্জিনটাও চলে গেল কোথায়।

হাত পা ছড়ে হতাশ হয়ে বরকা যখন বনের খোলা জায়গায় ফিরল, তখন দেখা গেল বন্ধু সেই খাদটার মধ্যেই মরচে ধরা পাইপটা নিয়ে বসে আছে।

'সে কী, তুই এখনো এখানে? তিয়াপাকে খুঁজছিস না যে বড়ো?' বিরক্ত হয়ে বললে বরকা।

'ধুত্তোর তিয়াপা, তিয়াপা!' হেঁড়ে গলায় ধমক দিল বন্ধু, 'এই দ্যাখ, ফুটোগুলো বন্ধ হয়ে গেছে কীসে। তারই জন্যে পড়ে গিয়েছিল রকেটটা। আর ঐটে,' অপসৃয়মান লুবকার উদ্দেশে বললে সে, 'এবার রটিয়ে বেড়াবে। কী করে টের পেলে যা হোক। বয়েই গেল। সবচেয়ে বড়ো কথা পিছু হটা চলবে না। দাঁড়া, পাইপটাকে পরিষ্কার করে ফের ছাড়ব। কিছুতেই অ্যাকসিডেণ্ট হবে না।'

'তুই তো আগেও বলেছিলি হবে না। তিয়াপাটার কেবল ধকল গেল। কোথায় যে গেল তাও জানি না...'

'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষকদের চরিত্র হওয়া চাই লোহার মতো,' ওকে থামিয়ে দিলে গেনা, 'আর তুই কেবল কোন এক খেঁকী কুকুরের কথা ভেবে মন খারাপ করছিস।'

'বটে!' ফুঁসে উঠল বরকা। 'খুব যে বৈজ্ঞানিক দেখছি। থাক তুই বসে তোর ঐ খাদের মধ্যে। আমি আর তোর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হচ্ছি না, তোর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই আমার!'

বোঁ করে ঘুরে ও চলে গেল বনের মধ্যে।

'তোর ব্যাগটা ফেলে যাচ্ছিস!' খাদের মধ্যে থেকে চ্যাঁচাল গেনা।

বরকা ফিরেও চাইল না।

গেনাকে তাই ল্যুবকার হাতে পায়েই ধরতে হল; বোঝাতে হল বন্ধুর ব্যাগটা যেন নিয়ে যায়। গর্বিত উদ্ভাবকের এই বিব্রত হতভম্ব ভাব দেখে ভারি অবাক লাগল তার। রাগ করার কথাও আর মনে রইল না।

বুঝদারের ভাব করে বললে, 'বেশ, নিয়ে যাব। কিন্তু মনে থাকে যেন, আমিও থাকব হাউই ছাড়ার সময়।'

নীরবে মাথা নাড়লে গেনা।

ব্যাগটা ল্যুবকা পেঁৗছে দিলে সন্ধ্যায়। বেল টিপতেই বাড়ির সকলেই ছুটে গেল দোর খুলতে, ভেবেছিল তিয়াপা। কিন্তু তিয়াপা আর ফিরল না।

কুকুরের প্রদর্শনীতে

হঠাৎ নিজের দু দুটি বন্ধুকে হারানো যে কী কষ্টের তা যদি জানতে। পুরনো চেনা মানুষটার কাছ দিয়ে যাবার সময় নির্বিকার ভাব ফোটানো যে কী কঠিন! আরো খারাপ এই যে দ্বিতীয় বন্ধুটি গেল নিজের দোষেই।

বন্ধুটি যে কী চমৎকার ছিল তা যদি জানতে! তার সঙ্গে প্রথম দেখা পাইওনিয়র শিবিরের পেছনে ভলগুশা নদী যেখানে হাঁসুলির মতো বাঁক নিয়েছে সেই তীরে। চান করতে গিয়েছিল বরকা, ফিরল একটা ভেজা, কম্পমান কুকুরের বাচ্চাকে গেঞ্জিতে জড়িয়ে। কুকুরছানাটা নিজেই নদীতে পড়ে গিয়েছিল নাকি নির্দয় গৃহস্বামী তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল কে জানে। ন্যাকড়ার মতো নরম কান আর সুবোধসুশীল স্বভাবের জন্যে ছেলেরা ওর নাম দিয়েছিল তিয়াপা। বরকার ভয় ছিল, কুকুরছানাটা উঁচু জাতের নয় বলে বাবার হয়ত ভালো লাগবে না, কিন্তু স্নেলভ কর্তা বললেন — রাস্তার কুকুরই সবচেয়ে মানুষের নেওটা।

বেড়ে উঠল তিয়াপা, মুখটা খানিকটা লম্বাটে হয়ে উঠল: বোঝা গেল ওর পূর্বপুরুষদের কেউ ছিল স্পিৎস জাতের কুকুর। কানদুটো কোনাচে হয়ে খাড়া হয়ে উঠল, নরম ঢেউ দেখা গেল তার গায়ের শাদা লোমে। সে যে কী সুন্দর! ভারি সূক্ষ্ম বোধ ছিল কুকুরটার — অচিরেই বুঝে ফেললে রান্নাঘরে গিন্নির পায়ে পায়ে ঘোরা বারণ, বরকা যখন সবুজ বাতিটার

সম্মুখে বই নিয়ে বসে তখন তার কাছে গিয়ে ভর করা উচিত নয়। তার যদি কিছু দরকার হত তাহলে প্রভুর মুখের দিকে সে জ্বলজ্বলে গাঢ় বাদামী চোখে চেয়ে থাকত, মনোযোগ আকর্ষণ করত।

এ বাড়িতে ওর ছিল নিজের বিছানা, নিজের পেয়ালা। সংসারের সবকিছু খুশির উপলক্ষ সে জানত। পিয়ন যখন 'সৈন্যবাহিনী, বিনামূল্যে' ছাপ দেওয়া নীল খামটা এনে দিত, তখন লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিত তিয়াপা, ঘেউ ঘেউ করে ছুটোছুটি লাগাত করিডরে, কিন্তু কেউ তাকে বকত না। সবাই গিয়ে জুটত বড়ো ঘরখানায় আর ইয়ারোস্লাভ ইভানভিচ চশমা চোখে দিয়ে জোরে জোরে পড়ে শোনাতেন বড়ো ছেলে সের্গেইয়ের চিঠি।

আর রবিবারের দিন! কী একটা চেনা লক্ষণ দেখে ঠিক বুঝে নিত সে। রবিবার দিনের যেন আলাদা কী একটা গন্ধ, আলাদা একটা ধ্বনি, আলাদা একটা মোহন রঙ।

শীতকালের রবিবার সে যে ঝরঝরে ঝনঝনে এক একটা দিন — বরকার স্কিদুটো তখন বরফের আস্তর কেটে পিছলে পিছলে ছুটত ঠাণ্ডা সূর্যের দিকে, আর আগে আগে ছুটত তিয়াপা, আনন্দের ডাকে তার গলা বুজে আসত, গড়াগড়ি দিত যতক্ষণ না স্কি এসে আবার তার সঙ্গ ধরত। তখন লাফ দিয়ে উঠে স্কি'র পাশাপাশি লাফালাফি ছুটোছুটি শুরু হত তার, তাকিয়ে থাকত বরকার চোখের দিকে।

গ্রীষ্মে ইঞ্জিনের ফোঁস ফোঁস, নয়ত ইলেকট্রিক ট্রেনের গুঞ্জন। কোলাহলে ভরা ভিড়াক্রান্ত কামরার মধ্যে সকলের সঙ্গে তিয়াপাও হুড়োহুড়ি করে ঢুকত, শহরতলির স্টেশনে এসে নামত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, তারপর ছাড়া পেয়েই ছুটত ঝাঁকড়া গোমড়া ফার বনের দিকে। এখানে

সে ছুটোছুটি করত, ডাকত, ভয় দেখাত কাঠবিড়ালী আর পাখিগুলোকে, নয়ত বরকার ছোড়া বলের সন্ধানে নাক গুঁজে বেড়াত ঘাসের মধ্যে।

সকলেই বুঝত তার এত আনন্দ কেন, কার না ভালো লাগে, খোলা হাওয়ায় ফুর্তিতে মাততে।

রাস্তাঘাটে, স্কুলের কাছে বরকাকে দেখতে পেয়ে কী আনন্দেই না পায়ের কাছে কোঁ কোঁ করে একটা শাদা পুঁটলির মতো লুটোপুটি খেত তিয়াপা। সারা গায়ে আঁচড় কামড়ের দাগ, জায়গায় জায়গায় লোম উঠে গেছে — দেখে বেশ বোঝা যেত, ভয়াবহ সব রাস্তাঘাটে, পরের বাড়ির আঙিনার গেটে বড়ো বড়ো কুকুরের মুখে পড়েও যে ঘোরাঘুরি করতে ছাড়েনি, তার জন্যে কতই না সাহস দরকার ...

আহ্ বরকা, তিয়াপার ওপর মায়া ছিল না তোর, আর এখন রাস্তায় রাস্তায় একা একা ঘুরছিস, খেয়ালই নেই যে শরৎ এসে গেছে। চারিদিক রোদে ভরা, পায়ের নিচে মুড়মুড় করে উঠছে পাতা, বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ, তরমুজ ছালের গন্ধ। কোনটা যে কার চেয়ে বেশি ঝলমলে রঙ্গিন বলা কঠিন: গাছগুলোর মাথা নাকি ফলের দোকানগুলো, নাকি পার্কে পার্কে শেষ মরশুমের ফুল।

রাস্তায় শুধু কুকুরের দিকেই বরকার যত নজর। অদ্ভুত এক জিনিস আবিষ্কার করলে ও। শাদা, কালচে, বাদামী সব কুকুরই সেদিন শিকল বাঁধা হয়ে মনিবদের পাশে পাশে চলেছে কেবল একই দিকে: ট্রাম লাইনের ওপাশের পার্কটায়। "এত কুকুর এল কোত্থেকে?" ভাবলে বরকা।

পাশ দিয়ে গেল একটা বিশালকায় গরবী গ্রেট ডেইন কুকুর, গলায় একটা চ্যাম্পিয়নের সোনার মেডেল ঠুন ঠুন করে বাজছে। কুকুরটাকে নিয়ে চলেছে একটি মোটাসোটা গিন্নি, সঙ্গে একটা বেতের ঝুড়ি — যা নিয়ে বাজারে যায় লোকে। তাদের কাছ থেকে একটা সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে রাস্তার লোকেরা, চারপেয়ে এই আশ্চর্য জন্তুটার প্রতিটি পেশী নিয়ে আলোচনা করে চলেছে তারা। কুকুরটাকে দেখে বরকা এতই তন্ময় হয়ে ছিল যে নজরই করেনি কখন পার্কে এসে হাজির হয়েছে কুকুরের প্রদর্শনীতে।

খোলা মাঠের ওপর পতপত করছে একটা সাদাসবুজ পতাকা, তাতে পাখি আর হরিণের মুণ্ডু আঁকা, নানা গলার ঘেউ ঘেউ ডাক উঠছে চারিদিক থেকে। চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল বরকার: ইস্ কত কুকুর! টেবিলের ধারে বসে আছে বিচারকেরা, তাদরে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে লম্বা-ঠেঙে বাঁকা চেহারার রুশী শিকারী-কুকুর। একবার ছাড়া পেলেই হয়, তীরের মতো শন শন করে ছুটে যাবে বাতাস কেটে, শিয়াল, খরগোস, নেকড়ে — নাগাল ধরতে পারে সবারই। নাম করা এই রুশী শিকারী-কুকুরকে সমীহ করে কুকুর বিলাসীরা নাম

দিয়েছে কুকুর তীরন্দাজ, এদের প্রতিটি কুকুরের ঠিকুজী, তাদের প্রপ্র-পিতামহ পিতামহীদের গোত্র পরিচয় সব এদের নখাগ্রে।

হয়ত এই কুকুর বিলাসীরা সবাই শিকারী। ওদের ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে এগুতে এগুতেই কুকুর বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল বরকা। শিকারী-কুকুরের পরে ঝাঁকড়া লোমো বেঁটে পায়ের যে কুকুরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল হুমড়ি খেয়ে খেয়ে পড়ছে, তার নাম স্প্যানিয়েল, এই নিচু চেহারার স্পেন দেশী কুকুরটার কান ঝুলে পড়েছে একেবারে মাটি পর্যন্ত, অনবরত ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো নড়ে চলেছে খাটো লেজ।

চক্রের মধ্যে দিয়ে চলে গেল আগুনে-লাল আয়র্ল্যাণ্ডের কুকুর 'সেটার' আর স্পোর্টসম্যানের মতো পেশীবহুল 'পয়েণ্টার'। টুক টুক করে গেল কুড়ুলের মতো দেখতে ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র সাহসী কুকুর — ফক্সটেরিয়ার। আর ন্যাড়া কালো যে ড্যাকস্‌হাউণ্ডগুলোকে বরকা ভাবত অকম্মা বিদঘুটে বলে, সেগুলো বাঁকা বাঁকা কিন্তু শক্ত পা ফেলে কী গম্ভীর চালেই না গেল। বিচারক মণ্ডলীর কাছে লম্বা লম্বা তালিকা দাখিল করল তাদের মনিবেরা। জানোয়ারের প্রতি হিংস্র এই কুকুরগুলো কত নেউল আর শেয়ালকে গর্ত থেকে টেনে বার করেছে, নয়ত তাড়া করে দিয়েছে শিকারীর গুলির মুখে।

সত্যি ড্যাকস্‌হাউণ্ডগুলোকে দেখে অবাক লাগল বরকার।

কিন্তু এস্কিমো কুকুরকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল তার। খাড়া খাড়া কান আর প্রায় পিঠের ওপর কুণ্ডলী-পাকানো-লেজওয়ালা শাদা শাদা কুকুরগুলোকে দেখে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল তার। মনে পড়ে গেল তিয়াপার কথা।

বরকার ভাবনায় বাধা পড়ল একটা বুড়োর কথায়। মাথায় তার একটা সেকেলে বিবর্ণ টুপি। বলছিল, 'এসব আর কী, শিকারী মণ্ডপে ঐ যে ভালুক দাঁড়িয়ে আছে — সেই হল দেখবার মতো। দেখবি, চল যাই।' বলে বুড়ো বরকাকে টেনে নিয়ে এল শিকারীদের সাজপোষাকের মণ্ডপে।

দেয়ালে ঝুলছে দুই নলা বন্দুক, লম্বা লম্বা ছোরা, টেবলের ওপর রবারের হাই বুট, ফাঁদ, শিকার করা পাখির জন্যে থলে, দরজার কাছে স্টাফ করা মস্ত এক কালচে বাদামী ভালুক। অমনি ঝাঁকড়া ভয়াবহ মূর্তিতে ভালুকটা গুহা থেকে রুখে এসেছিল শিকারীর দিকে, কিন্তু আঙুল তখন তার ট্রিগারের ওপর।

'লম্বায় পুরো দু মিটার,' মাপার ফিতে দুলিয়ে সগর্বে ঘোষণা করল বুড়ো, 'আর নখটা একেবারে ছয় সেণ্টিমিটার। একেই বলে দেহ। তোমার ঐ সব ফুচকে যত কুকুর কোথায় লাগে।'

'কিন্তু এ ভালুকটাকেও যে কুকুরেই ধরেছে,' বরকা বললে।

'ভালুককে মেরেছে শিকারী,' মাস্টার মশায়ের সুরে জবাব দিলে বুড়ো।
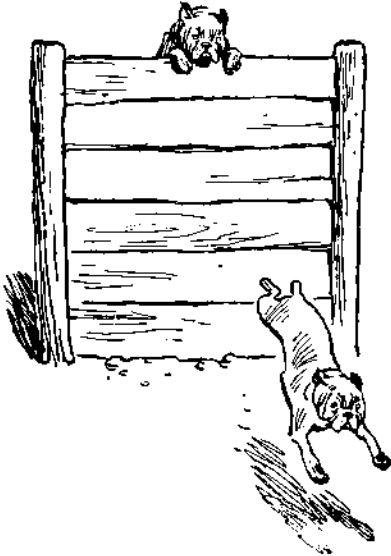
'এই যে প্ল্যাকার্ডে লেখা রয়েছে,' কুকুরের মান রক্ষায় বললে বরকা, 'মস্কো শিকারী সঙ্ঘের সদস্য স্ত্রেলনিকভের হাতে এস্কিমো কুকুর জ্ভংকায়া আর দ্রুজনায়ার সাহায্যে ভাল্লুকটি মারা পড়েছে নভগরদের কাছে।'

'লেখা যখন আছে তখন তোর কথাই ঠিক,' হার মানলে বুড়ো, 'তবে আসল কুকুর তুই দেখিসনি। ঐ দ্যাখ পাহারাদার কুকুর — কুকুর বটে, চোখে দেখেই মালুম।'

পাহারাদার কুকুরদের অংশটায় মাপার ফিতে দিয়ে একটু মেপে নেবার সুযোগ মেলেনি এই কুকুর-উৎসাহীর। এখানে সবকিছুই ছুটন্ত চলন্ত। ধুমসো তালার মতো ভারি আর মজবুত চোয়াল 'বকসার' কুকুরগুলো অতখানি ওজন নিয়েও আশ্চর্য অনায়াসে ব্যারিয়ার টপকে যাচ্ছে। কাঠের ওপর দিয়ে দিব্যি ছুটে যাচ্ছে ওরা, ঝাঁপিয়ে যাচ্ছে ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে, লাফিয়ে উঠছে উঁচু বেড়ার ওপর, দুই মিটার উঁচু থেকে গাঁত্তা দিয়ে লাফ দিচ্ছে আর সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠছে দর্শকরা।

একটু দূরে বেড়া ঘেরা জায়গাটায় লম্বা হাতা মোটা তুলোর জামা পরা একটা মূর্তিকে নড়তে দেখা যাচ্ছিল। বেতের ঝুড়িওয়ালা যে গিন্নিটিকে বরকা রাস্তায় দেখেছিল, সে হুকুম দিলে 'ফাস্!' আর বাছুরের মতো দেখতে কুকুরটা কয়েক লাফেই গিয়ে 'দুর্বৃত্তকে' ধরাশায়ী করে বিজয়ীর ভঙ্গিতে গিয়ে ভারী থাবা রাখল তার ওপর। সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে এ কুকুরের গলায় আরো একটা সোনার মেডেল ঝুলবে।

সেকেলে টুপি মাথায় বুড়ো যেই শুনলে যে বরকা ঘরোয়া কুকুরদেরও দেখতে চায় অমনি সে ছেড়ে গেল তাকে।

'যত বাজে সব, কুকুর না চুনোপুঁটি,' তাচ্ছিল্যে হাত নেড়ে সে চলে গেল।

গোল মণ্ডপটার মধ্যে থেকে কুকুরের ডাক আসছিল ঘণ্টার মতো। খোলা দরজার সামনে লাফালাফি করছিল একদল বাচ্চা, খিল খিল করে সমস্বরে তারা গাইছে:

আহা মরে যাই,
কুকুর দ্যাখো ভাই,
হাতের মধ্যেই বসে,
জল ভরা এক ডিশেই
ডুবে মরবে বুঝি!
হাহা, হিহি, হাহা!
কুকুর নাকি মাছি?
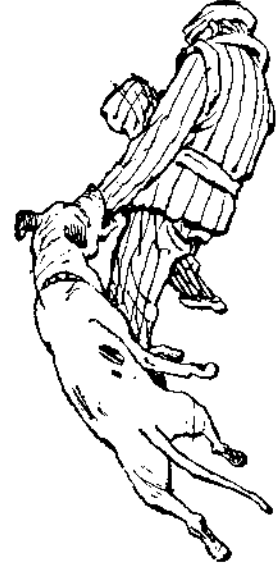
একটুও বাড়িয়ে বলেনি ছেলেগুলো। মণ্ডপের মাঝখানে বিচারকদের টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, তার হাতের তালুর মধ্যে ক্ষুদে এক মেক্সিকান কুকুর, ড্যাপা ড্যাপা চোখ। কিন্তু মেঝের ওপর নামিয়ে দিতেই সে কী লাফ। ঠিক যেন শেকলে বাঁধা মাছি। কেবল বিচারকরা অমন ভারিক্কী মুখ করে বসে থাকতে পারছে কেমন করে সেইটেই আশ্চর্য!

তারপর এল অদ্ভুত এক জীব, এমন লোমে ঢাকা যে কোনটা মাথা কোনটা লেজ বলা কঠিন। চাপা গর্জন করে উঠল জীবটা, হাঁ করল, তখন দেখা গেল তার আবার জমকালো দাড়ি গোঁপও আছে। অসঙ্কোচে হোহো করে হেসে উঠল বরকা আর তৎক্ষণাৎ তাকে বার করে দেওয়া হল দরজার ওপাশে। মিনিট খানেকের মধ্যেই দেখা গেল সেও ছোটাছুটি লাগিয়েছে মণ্ডপের আশেপাশে, ঘরোয়া কুকুরের চ্যাম্পিয়ন নির্বাচনের কাজে রীতিমত বাধা সৃষ্টি করে যোগ দিয়েছে ফুর্তিবাজ গায়ক দলের সঙ্গে:

নাপিতকে আন ডেকে
স্বচক্ষে যাক দেখে
কুকুর বেচারী
গজিয়েছে দাড়ি,
দোপাট্টা এক গোঁপ!
হাহা, হিহি, হাহা!
দুনিয়া আজব!

'হেসো না কিন্তু,' কে যেন বললে বরকার পেছন থেকে, 'এ কুকুরের গায়ে জোর কম নয়, কষ্ট সইতে পারে খুব।'

বরকা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। টেরিয়ার কুকুরের যে পক্ষ নিয়েছিল তাকে এক নজরেই কলেজ ছাত্র বলে চেনা যায়; রোগাটে চেহারা, শার্টের গলার বোতাম খোলা, চশমার পুরু কাচের নিচে আমুদে চোখ। তার সঙ্গিনীর চেহারাটি কিন্তু গোলগাল, লালচে, গায়ে একটা গ্রীষ্মের শাদা বর্ষাতি। একে দেখেও কেমন যেন মনে হয় কলেজ ছাত্রী।

তাহলেও বুকে লাল ফিতে বাঁধা বিচারকটি ওদের সঙ্গে যে রকম দহরম মহরম করছে, তাতে মনে হয় খুব সম্ভব ছাত্র নয়।

'সত্যি এই ছেলেগুলো! যত ঘোরাঘুরি কেবল এখানে।' অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বললে বিচারক, 'বলুন আরো এগিয়ে যাই, আরো চিত্তাকর্ষক কিছু আপনাদের দেখাব।'

'অত না ভেবেচিন্তে আমি কিন্তু টেরিয়ারটাকেই কিনতে রাজী,' মেয়েটির দিকে চেয়ে অনুচ্চ স্বরে বললে তরুণটি, 'কিন্তু আমাদের টাকায় কুলবে না। এটাকায় চারটে কুকুর কেনার ভার। ইস, আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টটি এমন কড়া।'

কথার টুকরোগুলো বরকার এক কান দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেল, আগের মতোই সে ফের ছোটাছুটি লাগাল মণ্ডপটার চারপাশে। এই যে লোকগুলো তার পাশ দিয়ে চলে গেল, তারা কে, তার হারানো বন্ধুর জীবনে কী ভূমিকা এরা পালন করবে সেকথা যদি সে জানত! কিন্তু লোকগুলোর কথা পরমুহূর্তেই ভুলে গেল সে। লাফালাফি আর রগড় করতে লাগল আগের মতোই।

কুকুরের মনিবরা কিন্তু টের পেয়েছিল এ দুটি লোক সাধারণ দর্শক নয়। বিচারক নিজে ওদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছে মেডেল পাওয়া আর চ্যাম্পিয়ন সব কুকুর।

'এই যে এটাকে একবার দেখবেন নাকি,' সঙ্গীদের বিচারক নিয়ে এল একটা শান্ত হয়ে বসে থাকা ভেড়া-খেদানো কুকুরের কাছে। 'খাঁটি জাতের কুকুর। পাঁচটা সোনার আর একটা বড় রুপোর মেডেল পেয়েছে।'

চশমা পরা ছেলেটি তার ক্ষীণদৃষ্টি চোখে নামজাদাটির দিকে চেয়ে তারিফ করলে, 'চমৎকার কুকুর। কিন্তু পরীক্ষার জন্যে বড়ো কুকুর ঠিক চলবে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বিচারক বললে, 'বলেছিলেন বটে আপনাদের বড়ো সড়ো দরকার নেই। এটা শুধু এমনি, দেখাবার জন্যে। আচ্ছা স্প্যানিয়েল হলে চলবে।'

'সেও একটু বড়োই হল...'

'তাহলে ফক্স। বড়ো নয়, খুব বাধ্য, সজাগ। দেয়ালের ওপাশের বাসিন্দে খবরের কাগজ খুললেও ও ঠিক শুনতে পেয়ে মিঠে গলায় ডেকে উঠবে।'

'না, না,' চূড়ান্ত স্বরে বললে মেয়েটি, 'আমাদের দরকার আরো সাধাসিধে গোছের, কষ্ট সইতে পারে এমন ...'

সেই মুহূর্তে তার সঙ্গী থামিয়ে দিল তাকে।

'ভালিয়া, দেখুন তো? চলবে ওটা?'

'চলবে!'

অভ্যাগত দুজনে মন স্থির করে এগিয়ে গেল বেড়ার দিকে। হলদে পাতার স্তূপের মধ্যে সেখানে একা একা শুয়ে আছে একটা নোংরা কুকুর। স্পিৎসের মতো লম্বা মুখটা কামড় খাওয়া, গায়ের লোম এককালে বেশ শাদা আর নরম ছিল বোঝা যায়, এখন তা কেমন জট পাকিয়ে ঝুলছে।

বিচারক সাবধান করে বললে, 'এটা আমাদের কুকুর নয়, হাঘরে রাস্তার কুকুর। কামড়ে দিতে পারে কিন্তু।'

কিন্তু কামড়াবার কোনো উদ্যোগ তার দেখা গেল না, বরং ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে পালাল রেলিঙের নিচ দিয়ে।

'আহা, ভড়কে দিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল চশমা পরা লোকটা।

'ঠিক এমনি কুকুরই আমাদের দরকার,' বললে মেয়েটি। নিচু হয়ে ডাকলে, 'চুচু, এই গুবরে, টেঁপী, ধবলী ...'

'আশা করি আমাদের প্রদর্শনীতে ও ধরনের কুকুর আর নেই। অন্য কোনো জায়গায় আপনাদের খোঁজ করতে হবে।'

এই বলে বিচারক তার বুকের ওপরকার লাল ফিতেটা ঠিক করে নিয়ে ফিরে গেল নিজের স্প্যানিয়েল আর ফক্সটেরিয়ারদের কাছে।

'এবার তাহলে কী করা যায় ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ?' হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল ভালিয়া।

'কাল আমি নির্ঘাৎ কথা বলব অ্যাকাউণ্টেণ্টের সঙ্গে,' ভুরু কুঁচকে বললে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, 'আমাদের যে টাকা উনি দিয়েছেন তাতে ভালো জাতের কুকুর কেনা চলে না! কিন্তু ব্যাপারটা কি দেখেছেন ভালিয়া? এটাকাও খরচই বা করব কী করে? কষ্টসহিষ্ণু জাতের যত কুকুর এসেছে সবই বড়ো বড়ো, আমাদের তাতে চলবে না। যত প্রদর্শনী আর নার্সারি, পিঁজরাপোল সব জায়গায় হানা দিয়ে তো দেখলাম, যত বন্ধুবান্ধবের কুকুর আছে কাউকে বাদ দিইনি। কিন্তু কিছুই ফল হল না।'

'শুধু আপনি নন,' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে ভালিয়া, 'আমাদের সব সহকর্মীরাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে, তারাও কিছু পায়নি।'

'আর যাদের খুঁজছি তারা ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের রাস্তায়,' বেশ নিশ্চিত ভাব করে বললে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, 'যেমন ধরুন এইটে, যেটা পালাল। কিন্তু আমি তো আর গিয়ে ধরতে পারব না। নির্ঘাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ব-আর চশমাটি ভাঙবে। তবে এবার আমি ঠিক বুঝেছি: আমাদের উদ্ধার করতে পারে কেবল সাধারণ হাঘরে কুকুর। খাঁটি রাস্তার কুকুরগুলো।'

খেঁকুরে

কুকুরের প্রদর্শনীতে এই যাদের দেখা গিয়েছিল তাদের ফের দেখা গেল পরদিন সকালে দোতলা একটা পুরনো একটেরে বাড়িতে, লোহার জালি বেড়া আর পপলার গাছে বাড়িটা রাস্তা থেকে আলাদা করা।

'নমস্কার ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ!' দূর থেকে চেঁচিয়ে বললে ভালিয়া, 'বেঁচে গেছি। আমি আগেই এসেছি, দেখলাম কুকুর হাজির!'

'তাই নাকি, এল কোত্থেকে?'

'কাল আপনার মুখ থেকে একেবারে দৈববাণী বেড়িয়েছিল: ভবঘুরে কুকুর। টাকাও লাগবে না, অ্যাকাউণ্টেণ্টের সঙ্গে ঝগড়াও করতে হবে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইতো ডাক শুনছি!' সানন্দে বলে উঠল তরুণটি।

গেটের দিকে গেল ওরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ছোট্ট ঘরে শাদা ওভারঅল পরলে। তারপর বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল কালো অয়েলক্লথে মোড়া দরজাটার দিকে।

কুকুরের করুণ ডাক ভেসে এল ওদের দিকে। লম্বা হলঘরটায় দুই সারি খাঁচা। কালও এ সব ছিল ফাঁকা, আর আজ লোহার শিকের ওপাশে ঘুরছে ফিরছে, গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এক পাল কুকুর।

বিনা পাসপোর্টের এই ভবঘুরেগুলো কিন্তু মোটেই খুশি নয়। স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত ওরা, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে লোকের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে, আঙিনায় মরিয়া লড়ালড়ি করতে ওরা অভ্যস্ত। যাই বল না কেন স্বাধীন জীবন বড়ো কঠোর: খাওয়া নেই, বৃষ্টি বাদলা আছে, শীতে জমে যায় পায়ের থাবা। কিন্তু তবু সে যে স্বাধীন এই অনুভূতি, তাদের দেখে ঘরোয়া সোহাগী কুকুরদের ভয়ে কাঁপুনি — সে যে এক মস্ত ব্যাপার!

'ঘেউ ঘেউ করছে দেখুন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, একেবারে মরিয়া হয়ে,' নালিশ জানালে জমাদার।

'কুকুর বলেই তো ঘেউ ঘেউ করছে,' আধা রহস্য আধা গুরুত্বের স্বরে বললে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

'ছয় নম্বর খাঁচাটার কুকুরটা কিন্তু বেশ বাধ্য পোষমানা,' বলে চলল জমাদার, 'রাস্তার কুকুর হলে কী হবে, ভারি সোহাগী। আমায় এর মধ্যেই চিনে ফেলেছে...'

খাঁচার ওপর ফলক আঁটা আছে। তা থেকে মেয়েটি সানন্দে নাম পড়ে শোনাল, ' "গুবরে" — কী চমৎকার কুকুর!'

গুবরের চেহারাটা মিষ্টি। শিকের ওপাশে লাফালাফি করল সে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, লেজ নাড়তে লাগল, বোঝা যায় সোহাগ কাড়ার ইচ্ছে।

'সে কী, প্রফেসর এখানে আগেই এসেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

'এসেছিলেন একেবারে ভোর সকালে,' জমাদার জানাল, 'সুন্দরীকে দেখা মাত্রই নাম দিয়ে দিলেন "গুবরে"।'

শাদা ওভারঅল গায়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ ধীরে সুস্থে খাঁচা থেকে খাঁচায় এগিয়ে গেল, ক্ষীণদৃষ্টি চোখ কুঁচকে নজর করে দেখতে লাগল প্রতিটি কুকুরকে। খাঁচার ভেতর থেকে বন্দীরাও তাকে পর্যবেক্ষণ করতে ছাড়ল না।

আগন্তুকদের দিকে সবার চেয়ে বেশি করে তাকিয়ে দেখল কিন্তু লম্বামুখো একটা শাদা কুকুর। এখানকার সব কুকুরের মতো এটিও রাস্তার কুকুর। কিন্তু দৈবক্রমে স্বাধীনতা পেয়ে ভবঘুরে হবার আগে তার ছিল এক মনিব, আর নাম ছিল তিয়াপা।

চশমা পরা তরুণ আর মেয়েটিকে সে দেখেই চিনেছিল। কাল দিনের বেলা ওদের কাছ থেকেই পালিয়ে রেলিঙের তলে গিয়ে ঢুকেছিল সে। সেখানে কারা যেন তাকে জাপটে ধরে,

গলায় দড়ি বেঁধে টেনে তোলে এক ঝরঝরে মোটর ভ্যানে, ধরা পড়া কুকুরের ডাকে সে ভ্যান তখন ভরপুর। রাত্তিরে তিয়াপা কাটিয়েছে কুকুরের খোঁয়াড়ে, সকালে মালটানা মোটর ভ্যানে করে এসেছে এই বাড়িতে।

অন্য কুকুরগুলোর মতো ডাকছিল না সে, কিছু তার চাই না, কাউকে সে বিশ্বাস করে না।

'আরে দেখুন তো ভালিয়া, এটা সেই প্রদর্শনীর সেই কুকুরটা না?' তিয়াপার সামনে থেমে জিজ্ঞেস করলে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

ভবঘুরেটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল ভালিয়া।

'তাই নাকি? আরে হ্যাঁ, ঠিক। ওইটাই, স্পিৎসের মতো দেখতে। তবে কাল ছিল আরো নোংরা।'

মানুষটা দরজার হাতল ধরতেই তিয়াপা খাঁচার কোণ থেকে চাপা গলায় গরগর করলে।

'সাবধান কমরেড ইওলকিন,' জমাদার বললে, 'কুকুরটা ভারি রগচটা।'

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ হেসে ঢুকল খাঁচার মধ্যে।

'আমরা যে পূর্বপরিচিত...'

হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া মাত্রই তিয়াপা খপ করে এসে কামড়ে দিল তার হাতের তালুতে।

'ঐ! মাগো!' চেঁচিয়ে উঠল ভালিয়া, যেন ওকেই বুঝি কামড়েছে।

যন্ত্রণায় মুখটা একটু কুঁচকে উঠল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের।

'আরে শয়তান, খেঁকুরে!'

'বটেরে বেয়াদব!' চেঁচিয়ে উঠল জমাদার, 'কামড় দেখাচ্ছিস, দাঁড়া তোকে এই ঝাড়ু দিয়ে দেখাচ্ছি!'

ঝাড়ু নিয়ে এগিয়ে গেল সে।

ভবঘুরেটি কোণ ঘেঁসে গিয়ে ওঁৎ পাতল, লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল তার ঘাড়ের ওপর। ছোট্ট একটা গর্জন শোনা গেল, তারপর শুরু হল এমন ঘেউ ঘেউ যে মনে হল এই বুঝি দমবন্ধ হবে কুকুরটার। গোটা পালও সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলাল। ঝাড়ু দেখেই অসম্ভব ক্ষেপে উঠল কুকুরগুলো।

'ঝাড়ু সরিয়ে নিন বলছি!' কড়া গলায় বললে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। 'আমারই দোষ। আর কুকুরের ওপর চোটপাট করবেন না। ঝাড়ুটা বরং সাধারণত লুকিয়েই রাখবেন। আমাদের দরকার চুপচাপ, শান্তি।'

রুমাল দিয়ে ডাক্তারের হাত বেঁধে দিলে ভালিয়া। তারপর চলে গেল দুজনে।

জমাদার কিন্তু শুনিয়ে শুনিয়ে আরো অনেকক্ষণ বকবক করলে এই বলে যে এমন কুকুরও

আছে যারা ভালোমানুষির মূল্য দেয় না, মোটেই বোঝে না কে কেমন ধারা লোক, এমন কি সম্মানী বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদেরও কামড়াতে ছাড়ে না।

বকবক করতে করতে খাঁচাগুলো খুলে হোসপাইপ দিয়ে প্রতিটি কুকুরকে জল দিলে, খড় পাতলে, তারপর ডিশে করে নিয়ে এল সুস্বাদু যবের সুপ। তিয়াপার খাঁচাতেও একটা ডিশ সে রাখলে, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল গুবরের কাছে।

'কী রে গুবরে, কেমন লাগছে আমাদের এখানে?' নিজের পেয়ারের কুকুরটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে জমাদার, গুবরে অবিশ্যি ততক্ষণে তৃপ্তিসহকারে হাড় চিবাতে শুরু করেছে, 'খুব এসে পড়েছিস যা হোক। রাস্তা থেকে একেবারে সরাসরি ইনস্টিটিউটে, সরকারী টাকায় খাবি থাকবি। কিন্তু কেন জানিস? কারণ তুই দেখতে ছোটো। আমাদের এখানে ছোটোরই কদর।'

অদ্ভুত সব কথা বলছিল লোকটা। কুকুরের দুনিয়ায় এতদিন ধরা হত, যে কুকুর সবচেয়ে বড়ো সেই সুখী। তার ভাগ্যেই সর্বদাই আঁচড় মেলে কম, মুখরোচক হাড় মেলে বেশি। একটা গ্রেট ডেইন বা ভেড়া-খেদানো কুকুর হবার সাধ কোন ছোটো কুকুরটার না আছে? আর এ জমাদারের দেখছি সবই উলটো ...

নিজের সুপটি চেটেপুটে খেলে তিয়াপা, কিন্তু খুব একটা শান্তি পেলে না। সত্যি কেমন করে পাবে। ভেবেছিল অপরাধের জন্যে শাস্তি পেতে হবে। তার বদলে এসে গেল খাবার। কিছুই বুঝে উঠতে পারল না তিয়াপা। হয়ত বা অন্ধকারের অপেক্ষায় আছে সব, তখন ঝাপটে ধরে গলায় দড়ি বেঁধে ঝাড়ুপেটা করবে?

নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। বেশ সতর্ক লঘু ঘুম হলেও সে টের পেলে না কখন জমাদার তার খাঁচার ওপর খড়ি দিয়ে লিখে দিল "খেঁকুরে"।

মহাজগতের ডাক্তার

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কুকুরদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে সেটা খুব ভালো লাগত ভালিয়ার। কখনো গলা চড়াত না সে, চটে উঠত না। যেন কুকুর নয়, ছোটো ছোটো ছেলেদের মানুষ করে তুলছে।

শাস্তির সশঙ্ক প্রত্যাশায় কয়েকদিন কাটল তিয়াপার। ভয়ানক বুক ঢিপ ঢিপ করে রাত্রে জেগে উঠত সে, খাড়া হয়ে উঠত চার পায়ের ওপর, জান বাঁচানোর জন্যে রুখে দাঁড়াত একেবারে, আস্তে হলেও বেশ ভয়ানক সুরে গরগর করে উঠত।

'নিশ্চয় ঝাড়ুটাই ওর চক্ষুশূল,' ভালিয়াকে বলত ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

চশমার তল থেকে সহৃদয় চোখে সে চেয়ে দেখত কুকুরটার দিকে। এই সব মুহূর্তে কেমন অস্বস্তি লাগত তিয়াপার, মাথা নাড়াত এদিক ওদিক। অপ্রীতিকর ঘটনার কথা মনে পড়ত কেবল তার নতুন নামটায়। ওকে যে সবাই খেঁকুরে বলে ডাকে এটা ওর কিছুতেই অভ্যাস হচ্ছিল না।

'ভয় নেই,' মনের ভাবনাটা শুনিয়ে শুনিয়েই বললে ডাক্তার, 'শান্ত হয়ে আসবে, মন বসবে, হয়ে উঠবে এক খাসা মহাকাশযাত্রী। কী বলেন ভালিয়া?'

'মহাকাশযাত্রী...' স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বললে ভালিয়া, 'ভেসে যাওয়া মহাকাশ দিয়ে। খেঁকুরে তো আর জানে না ওর ভবিষ্যৎ কী সুন্দর। কী চমৎকারই না হত যদি আমি যেতে পারতাম ওর জায়গায়!'

'এই রে! শুরু হয়েছে তো সব ছেলেমানুষি,' ভুরু কোঁচকাল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, 'আপনি হলেন মহাজগতের চিকিৎসাকর্মী ভালিয়া, কথাটা দয়া করে যেন ভুলবেন না। জাহাজের ডাক্তার জাহাজেই যায়। ফুটবল টিমের ডাক্তার বসে থাকে গোল পোস্টের কাছে বেঞ্চিতে। সার্জেন রোগীর ওপর অস্ত্রোপচার করে টেবিলে। আর মহাজগতের ডাক্তার — সবচেয়ে জরুরী মুহূর্তটিতে কিন্তু সে উড়ো জাহাজে নয়, রকেটে নয়, তার ইনস্ট্রুমেণ্টের কাছে।'

'আমার কেবলি মনে হয়,' একটু আহত স্বরে বলল সহকারিণী, 'আপনি যেন একেবারে মহাজগতের ডাক্তার হয়েই জন্মেছেন। ছেলেবেলায় খেলনাপাতি নিয়ে নয়, ডাক্তারি ইনস্ট্রুমেণ্ট নিয়েই বুঝি খেলা করেছেন।'

হেসে উঠল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

'রাগ করবেন না ভালিয়া লক্ষ্মীটি; জানেন, আমার জীবনে যা ঘটেছে সে ভারি চমৎকার।

আপনাদের কাছে সবই খুব সোজা সাপটা। কাল স্কুলে পড়েছেন — আজ ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আর কাল — জানেনই তো কাল কী হবেন, কলেজে পড়ছেন। আর আমি যখন পড়তাম তখন রকেট তো ছিলই না, জেট প্লেনকেই ধরা হত খুব অভিনব বলে। আর আমি ভাবলাম, পশুচিকিৎসকই হওয়া যাক।'

'তারপর কী হল?'

'হল এই: কলেজ শেষ করলাম। আমায় বললে দুটো সাবেকী বিজ্ঞানকে মেলাবার কাজে যোগ দিতে চাও — চিকিৎসাবিদ্যা আর জ্যোতির্বিদ্যা? কাজ করবে সবচেয়ে নতুন একটা বিজ্ঞান — মহাজাগতিক চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে? বুক ধক করে উঠল আমার — পাখা মেলে যেন একেবারে উড়ে গেলাম। তারপর এই এখানে...'

ভাসিলি ইওলকিন যখন পশুচিকিৎসা কলেজের ছাত্র হয় তখন কেউ অবাক হয়নি। জীবজন্তু নিয়ে তার উৎসাহের কথা বাড়ির লোকে, স্কুলে, বলতে কি গোটা পাড়াতেই সবাই জানত। এলোমেলো চুল, নরম হাসি আর হাড্ডিসার চেহারার এই লম্বা ছোকরাটাকে দেখলে ছেলেরা চ্যাঁচাত, 'গরুর বদ্যি, ও গরুর বদ্যি, পেট ব্যথা করছে আমার।' ওরা জানত লোকটা চটে না, ছুটে এসে তারা, তার ফুলে ওঠা পকেটের মধ্যে কৌতূহলী উঁকি দিত। সর্বদাই কিছু না কিছু একটা নড়াচড়া, ফোঁসফাঁস, কিচিরমিচির করত সেখানে। বুড়িরা গিন্নিরা ইওলকিনের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসত চোখ না ফোটা কুকুর বেড়ালের বাচ্চা। পথে ফেলে দেওয়াদের প্রথম ঘর মিলত কাঠের বাক্সে। ভাসিলির কামরার কোণে জমে উঠেছিল সজারু, গিনিপিগ, কাছিম আর অন্যান্য নানা প্রাণীর এক দিব্যি সংসার।

ঝঞ্ঝাটও বাদ যেত না। ভালিয়ার কাছে গল্প করেছিল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ:

'বাড়িতে একদিন হুলুস্থুলু বেধে গেল। ডাস্টবিন থেকে একটা সাপ বেড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল আঙিনায়। সে কী কান্ড! চিৎকার, চেঁচামেচি। ঝটপট দরজা জানলা সব বন্ধ। কেউ আর বেরয় না। মিলিশিয়ার লোক আর দরোয়ান লাঠি হাতে একেবারে আমাদের ফ্ল্যাটে: এখুনি আঙিনা পরিষ্কার করে ফ্যালো! আমি তখন ঘরে নেই। স্কুলে। মা বললে, "আমাদের এখানে মোটেই কোনো সাপ কখনো ছিল না। সব দোষই চাপাবে আমার ছেলের ঘাড়ে? নিজেরা পরিষ্কার করো গে!" ওরা গিয়ে হাজির হল স্কুলে, হেড মাস্টারের কাছে। আপনাদের জীববিজ্ঞানীটিকে একবার চাই! লোকে কাজে যাবে, দোকানপাট করবে, কিন্তু কেউ বেরতে পারছে না। অমনি আমি বুঝলাম ব্যাপার কী। জলা থেকে আমি আগের দিন কিছু হেলে সাপের ডিম জোগাড় করেছিলাম। মা নিশ্চয় সেগুলোকে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েছে। আর ডাস্টবিনের গরমের মধ্যে রোদ্দুরে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে থাকবে। পথে যেতে যেতে কী, কেন, কোথায় এসব বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মিলিশিয়ার লোকটা কোনো কথাই শুনতে চায় না, কেবলি বলে, "বিষাক্ত সাপ দিয়ে বাসিন্দাদের সবাইকে ভয় দেখানো হচ্ছে!" ডিম ফোটা সবকটি বাচ্চাকে খুঁজে বার করে দেখালাম, কামড়ায় না। হলে কী হয় জরিমানা কিন্তু মাপ হল না... তখন কিন্তু ভালিয়া আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি যে আমার ঐ নেশাটাই হয়ে উঠবে আমার পেশা...'

দ্বিতীয় ঘটনাটার কথা ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কারো কাছেই বলেনি: কী ভাবে বিমান স্কুলে ভর্তি হবার চেষ্টা করেছিল সে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভিতকা চের্নিয়ায়েভ ছাড়া আর একটি লোকও জানত না যে এই বিদঘুটে ভালোমানুষ ইওলকিন, ছেলেরা যাকে গরুর বদ্যি বলে ডাকে, সে জীববিজ্ঞানী নয়, পশুর ডাক্তার নয়, এমন কি আফ্রিকায় শিকারী হবারও স্বপ্ন দেখত না, স্বপ্ন দেখত বৈমানিক হবে। সব ছেলেরই বৈমানিক হবার সাধ থাকে, কিন্তু পরে যত বয়স বাড়ে তত অন্যরকম নানা ইচ্ছা আর সংকল্প দেখা দেয়। ভাসিলি কিন্তু স্কুলের পরীক্ষা শেষ হতেই তার বন্ধু ভিতকার সঙ্গে গিয়ে দরখাস্ত দেয় বৈমানিক স্কুলে।

'নমস্কার কমরেড... ক্যাপটেন,' টেবলের ওপাশে যে সামরিক লোকটি বসেছিল তার কাঁধের স্ট্র্যাপে তারার সংখ্যা গুনে চোখ কুঁচকে বললে ইওলকিন।

'নমস্কার,' বলে ক্যাপটেন টেবল থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে দেখালেন। 'হেড লাইনটা পড়ুন, না না, এগিয়ে আসবেন না, ঐখান থেকেই। বটে... চশমা আছে? তাহলে দরখাস্ত দিলেন যে বড়ো? বুঝেছি, বুঝেছি... কিন্তু বৈমানিকের শুধু একটি চশমা — বৈমানিক চশমা।'

বন্ধুকে কিন্তু ভর্তি করে নিয়েছিল ওরা। নিজের উল্লাস চেপে সে এসেছিল ভাসিলিকে সান্ত্বনা দিতে:

'সে গরুর বদ্যি, মন খারাপ করিস না। চশমা পরা ডাক্তার, সে তো আরো ভালো। বেশ ভারিক্কী ...'

ভিতকা সৌভাগ্যবান, বিমানের সবকিছু সে শিখলে, লাফ দিত প্যারাশুট নিয়ে, ট্রেনিং বিমানে বাঁক নিয়ে 'লুপ' করে দেখাল এবং মোটের ওপর তৈরি হল জেট বৈমানিক হিসাবে। পরে জেট ফাইটার চালাত সে, পৃথিবীটাকে দেখত আকাশের উপর থেকে।

মনে মনে তাকে ঈর্ষা করত ভাসিলি। কিন্তু হঠাৎ যখন অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে উঠল মহাকাশের ডাক্তার তখন আর হিংসা হত না। পৃথিবীটাকে চের্নিয়ায়েভ যেভাবে দেখেছে, ইওলকিন সেভাবে দেখত না। পৃথিবীটা তার কাছে বন, নদী, নগরের ছোপ নয়, মস্ত একটা গোলক তাতে মহাদেশ আর মহাসমুদ্রের রেখা। ওড়বার জন্যে ইওলকিন যাদের তৈরি করবে তাদের চোখে পৃথিবীটা তো ঠিক এই রকমই লাগবে।

সানন্দেই সে মহাজগতের ডাক্তার হিসাবে কাজ করতে লাগল। কিন্তু একটা জিনিসে তার কিছুতেই অভ্যেস হল না। লোকে যে তাকে ভাসিলি বলে না ডেকে সম্মান দেখিয়ে পুরো নাম ধরে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বলে ডাকে এটা তার বরদাস্ত হত না। কেমন বিব্রত হয়ে লাল হয়ে উঠত সে। তারপর একদিন এই ভেবে শান্ত হল যে সম্মানটা ব্যক্তিগতভাবে ওর প্রতি নয়, নতুন বিজ্ঞানের প্রতি।

ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!

'আচ্ছা, কুকুর নিয়ে শুরু করেছি কেন আমরা?' ল্যাবরেটরি মেয়েটি একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ডাক্তারকে, 'ব্যাঙ নয়, বাঁদর নয় — কেবল কুকুর?'

ইওলকিন বলেছিল, 'আমার ধারণা, তার অনেক কারণ আছে। কারণ ওদের জীবসত্তা আমাদের মানুষের মতো, কারণ ওরা সহজেই অভ্যস্ত হয়ে যায়, বিশ্বাস রাখে, কারণ পরীক্ষার সময় ওরা শান্ত থাকে, নার্ভাস হয় না। কতবারই তো ভালিয়া, মানুষকে বাঁচিয়েছে কুকুর। শিকারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, হাসপাতালে। সন্ধান কাজে ওরা আছে সব সময়। এখন মহাকাশের ব্যাপারেও। এবার চলুন যাই আমাদের পালিত শিশুগুলির কাছে। দেখা যাক, কেমন আছে।'

সন্ধানীরা কিন্তু নিজেদের অমন জরুরী ভূমিকায় একটুও বিচলিত না হয়ে দিব্যি আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল। বেশ লাগছিল ওদের আদর আপ্যায়ন, বেশ বুদ্ধিমানের মতো রান্না করা খাবার—হাড়, রগ তার মধ্যে রোজ থাকবেই, সেই সঙ্গে টুকরোখানেক মাংসও। ডাক যদি বা শোনা যেত, তবে সেটা নিতান্তই শান্তিপ্রিয় ডাক।
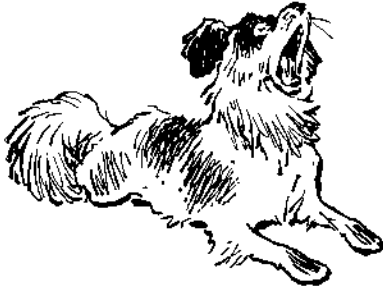
গত কালের এই হাঘরেগুলোকে ধোয়া পাকলা, আচড়ানো, বুরুশ, ওজন নেওয়া, মাপ নেওয়া, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, ভদ্রতা শেখানোর জন্যে কত লোকেই না উদ্‌গ্রীব। দুষ্টুমি করার জন্যে চড় চাপড় যদি বা কেউ কখনো পায় তো শুধু ফুর্তির সময়েই, তার জন্যে কেই বা রাগ করবে।

এমনকি গায়ে দাগফুটকিওয়ালা যে কুকুরটার ডাকনাম জুটেছে 'ফুটকি' সেটা পর্যন্ত শান্ত হয়ে উঠল, অথচ আগে যে কোনো একটা ছুতোয় ঘেউ ঘেউ করে একেবারে গলা ভেঙে বসত। একটা শুধু বিচ্ছিরি অভ্যেস রয়ে গেল ফুটকির। কেউ তার পেছন দিকে দাঁড়ালেই সে চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে দাঁত দেখাত। বোঝা যায় কেউ কখনো তাকে পেছন থেকে লুকিয়ে এসে মেরেছে। ফুটকি যদি তার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকত বা ঘুমত, তাহলে কেউ আগে না ডেকে তার কাছে আসত না।

সকলের কাছ থেকেই ভালোবাসা পেত কিন্তু গুবরে। লেজখানা ওর ছিল অপূর্ব, কুকুর হৃদয়ের সবখানি সে প্রকাশ করত ঐ লেজের মধ্যে দিয়ে। যখন খুশি হত তখন রঙমিস্ত্রির থুপনির মতো দুলত তার ফুঁয়ো ফুঁয়ো লেজটা। না থেমে একশ বার, হাজার বার সে দোলাতে পারত লেজ, একটুও ক্লান্ত হত না। মানে, হয়ত বা মিনিট খানেকের জন্যে মাথাটা আর লেজটা কখনো নামাত, সেটা আদর কাড়ার জন্যে, তারপরেই ফের তার বিশেষ ঢঙে খাড়া হয়ে উঠত, যেন বলত, এ জীবনে আমি ভারি খুশি। আর যেই লড়াক্কু মেজাজ আসত অমনি কী উদ্ধতভাবেই না খাড়া হয়ে উঠত লেজ, আর নিজে কখনো দোষ করলে তেমনি লজ্জায় পেটের মধ্যে লেজ গুটিয়ে যেত। আবার ডিশ হাতে জমাদারের উদয় হবার সময়

কেবল তার লেজের ডগাটিতেই মনের যে আলোড়ন ফুটে উঠত তা ভাষাতেও প্রকাশ করা যায় না। অপূর্ব লেজ নয় কি!

গুবরের ঠিক বিপরীত হল গদাইলস্করী আলসে কুকুর পাম। সবসময়ই সে হাই তুলছে, আড়িমুড়ি ভাঙছে। শাদাটে মুখের দুপাশ দিয়ে ঝোলা ঝোলা কালচে কান, মনে হয় যেন কোনো দর্জি বুঝি ভুল করে ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।

মসৃণ লোমের রোগাটে কুকুর খোকন তাকায় বেশ গুটিগুটি কালো কালো সত্যবাদী চোখে। আর ঠিক অমনি নিরীহ মুখ করেই কিন্তু দিব্যি তুলে নিতে পারে পকেট থেকে বেরিয়ে আসা রুমাল। হাতে নাতে ধরা পড়লে আবার মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোষী দোষী মুখ করে লেজ নামিয়ে নেবে। সেই সঙ্গে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকবে লোকটার চোখের দিকে, যেন তার অকপট দৃষ্টি দিয়ে বলতে চায়: "দেখলেন তো রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কী শিক্ষা হয়। অবিশ্যি এটা যে খুব শোভন নয়, তা বুঝি, কিন্তু কী করি বলুন..." অথচ এই অকপট স্বীকারোক্তির মিনিট কয়েক পরেই চোট্টা কুকুরটা ফের আবার কিছু না কিছু চুরি করে বসবে। সত্যি, বেশ ভালোরকম মনোযোগ দিয়ে মানুষ করে তোলা দরকার ওকে!

দিনের পর দিন যায়, অন্য কুকুরদের মতো তিয়াপারও বদল হয়েছে অনেক: চকা ভাবটার বদলে এসেছে প্রশান্তি। বলতে কি একটু বেশি রকমেরই শান্ত হয়ে উঠল সে, গলা চড়াত কদাচিত, ছটফট করত না, জালির মধ্যে দিয়ে পড়শীকে কামড়াবার কোনো চেষ্টা করত না। কিন্তু এই শান্তির সঙ্গে উদাসীনতা বা আলস্যের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ও যেন মূর্তিমান সতর্কতা। তীরের মুখের মতো তীক্ষ্ম কানদুটো তার সর্বদাই মুখিয়ে, পরিস্থিতির যে কোনো বদলেই চোখ তার সজাগ। বোঝবার চেষ্টা করত তিয়াপা, শাদা ওভারঅল পরা লোকগুলো কী চায় তার কাছ থেকে, এত দয়া মমতার উদ্দেশ্য কী? নতুন কোনো একটা দুর্ভোগ জুটবে না তো?

ইওলাকিন একদিন ওর খাঁচার কাছে রইল বরাবরকার চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বেশ স্থির সংকল্প নিয়েই সে দরজা খুললে:

'চলরে খেঁকুরে!'

খুশি হল তিয়াপা, জ্বলজ্বল করে উঠল ওর কালো চোখদুটো। অসহ্য এই খাঁচাটা থেকে শেষ পর্যন্ত বেরুনো গেল তাহলে! এই অপ্রত্যাশিত খুশিটা কিন্তু তিয়াপা মোটেই ফাঁস করল না। ধীরে সুস্থে উঠে এই যে অদ্ভুত লোকটা তাকে শাস্তি দিতে ভুলে গেছে, তার পেছু পেছু সে চলল আস্তে আস্তে। গেল সে মাথা না তুলে, লম্বা বারান্দা ধরে, কালো জুতোর ক্ষয়ে যাওয়া হিলের পেছু পেছু, আর নিজের ধরনে যাচাই করতে লাগল বাড়িটাকে। প্রথমটা বার্নিশ করা কাঠের মেঝের ঝাঁঝালো গন্ধে নাকের মধ্যে খানিকটা শুর শুর করল, সেটা ছাপিয়ে রান্নাঘর থেকে তপ্ত স্বাদু গন্ধের ঝলক বয়ে গেল, তারপর ডিসপেনসারির গন্ধ টের পেলে তিয়াপা।

যে কামরাটায় ওরা ঢুকল সেখানে তেমন বিশেষ কিছু গন্ধ ছিল না। তাহলেও মেসিনের তেলের একটা আবছা গন্ধ বেশ টের পেলে তিয়াপা। দেয়াল বরাবর কতকগুলো কালো কালো শাদা শাদা বাক্স। একের পর এক নাক দিয়ে সেগুলোর ঠান্ডা ধাতুর পরখ নিলে তিয়াপা।

কী একটা ঝিঁঝিঁ শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল তিয়াপা। শব্দ উঠছে একটা ছোট্ট বাক্স থেকে, মানুষটা তা কখনো এ গালে কখনো ও গালে চেপে ধরছে। এমন অদ্ভুত জিনিস তিয়াপা জীবনে দেখল এই প্রথম।

তিয়াপার সতর্ক দৃষ্টি লক্ষ্য করে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বললে, 'একটু দাড়ি কামিয়ে নিলে তুই আপত্তি জানাবি না তো? প্রথমটা ইলেকট্রিক ক্ষুরের সঙ্গে পরিচয় কর, তারপরে অন্যান্য সব যন্ত্রপাতির সঙ্গে।'

পরিষ্কার হয়ে নিয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ ইলেকট্রিক কর্ডটা ভাঁজ করে ক্ষুরটাকে চালান করে দিলে পকেটের মধ্যে। তারপর কালো মস্ত বাক্সটার কাছে এসে আঙুল দিয়ে একটা বোতাম টিপল। উর-র-র-র শব্দ করতে লাগল বাক্সটা। পিছিয়ে এল তিয়াপা, কিন্তু সেখান থেকে চোখ নড়াল না।

উত্তেজনায় তিয়াপার লম্বা মুখটা যেন ছোটোই হয়ে গেল, খাড়া হয়ে উঠল ঘাড়ের লোম। অভিজ্ঞতায় তিয়াপা জানত, যেসব জিনিস গোঁ গোঁ বোঁ বোঁ করে তা, বলা যায় না, স্থানচ্যুত হয়ে ছুটে আসতে পারে তার দিকে।

ইলেকট্রিক মোটরটা চুপ করে যেতেই নতুন একটা যন্ত্র চালাল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। পরিশ্রান্ত একটা সেকেলে ইঞ্জিনের মতো ফোঁস ফোঁস করতে লাগল জিনিসটা। ফুস-ফাস ফুস-ফাস করে পাম্পটা যেন নালিশ করে চলল তার একঘেয়ে একই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে,

যেন তার ভিতরকার তেলটাকে সারা জীবন ধরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ফেলতে হচ্ছে বলে সে ব্যাজার। ফুস্ বলে শেষ বারের মতো শব্দ করে চুপ করে গেল পাম্পটাও।

ঘরের মাঝখানে বসে চোখ মিটমিট করতে লাগল তিয়াপা।

'অভ্যেস কর, অভ্যেস করে নে রে খেঁকুরে,' ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বললে, 'তোর কাজ হবে যে যন্ত্রপাতি নিয়ে।'

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ তারপর একটা হাল্কা রঙের এনামেল করা বাক্সের কাছে গিয়ে সেটাকে চালিয়ে দিলে। একটা তীব্র খনখনে আওয়াজ উঠতেই তিয়াপা তো একেবারে দরজার দিকে ছুট। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল আওয়াজটা, নীরবতার মধ্যে শোনা গেল একটা শান্ত স্বর:

'ভয় নেই, প্রধান কথা হল ভয় না পাওয়া! তুই তো সাহসী কুকুর — এতে ভয়ের কী আছে।'

দরজায় পিঠ দিয়ে বসল তিয়াপা, বুদ্ধিমানের মতো চাইল মানুষটার দিকে। মানুষটা কিন্তু হাসছে: না, কুকুরটা তাহলে ভয়-পাদুরে বাচ্চা নয়।

ফের বাক্সটার কাছে এল ডাক্তার। এবার কিন্তু না হকচকিয়ে বিদঘুটে আওয়াজটা তিয়াপা ধৈর্য করে শুনে গেল।

মানুষটা বললে, 'থাক, আজ এই যথেষ্ট।' কালো জুতোর পেছু পেছু ফিরতি পথ ধরে রওনা দিল তিয়াপা। তার কানে তখনো আওয়াজটা বোঁ বোঁ করছিল, তাই বারান্দার নানান গন্ধের দিকে সে এতটুকু মন দিলে না।

খেঁকুরের পড়শীদেরও যেতে হয়েছিল ওই কামরাটায়। কেউ বেশ সইল, কেউ জবাবে ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে, কেউ এমন কি পাম্পের শান্ত ফোঁসফোঁসেই ভড়কে গিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বার কয়েক মহড়ার পর আওয়াজগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেল সবাই।

তারপর ভাবী সন্ধানীদের এক এক করে খাঁচায় অভ্যাস করানো হল। খাঁচার আয়তন কিন্তু প্রতিদিন কমতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তা এমন ঘুপচি হয়ে উঠল যে দুপাশ থেকে তা এঁটে এল আর নাকের কালো ডগাটা গিয়ে ঠেকল ঠাণ্ডা লোহায়।

কুকুরগুলোর কাছে মনে হল এটা বড়ো একঘেয়ে খেলা, অনেকদিন ধরে তা চলছে। ডাক্তারের মতে কিন্তু এটা খুব জরুরী একটা পরীক্ষা, তার নাম তারা দিয়েছিল 'স্বাধীনতার সংক্ষেপণ'।

যে কোনো একটা কুকুরকে একবার সুটকেসের মধ্যে বসাবার চেষ্টা করে দ্যাখো না, এমন চিৎকার জুড়বে যে ঘর ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে হবে। আর এতদিন যারা ছিল ভবঘুরে, তাদের
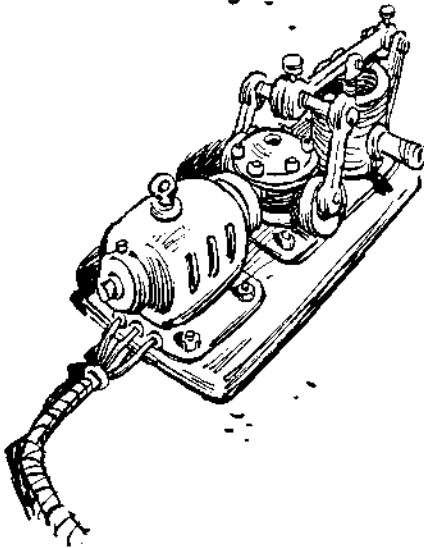
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হলে তো আরো সাবধান হওয়া দরকার। খাঁচার মধ্যে থেকে ভবঘুরেরা শিখল: এটা ময়দান নয়, রাস্তা নয়, খিড়কি নয়, তারই ঘর। পরের খাঁচাটা হল আরো ছোটো, আর তা থেকে ওরা শিখল — রাস্তা নয়, খিড়কি নয়, কালকের ঘরও নয়, এ তার নতুন ঘর। তাই শান্ত হয়ে থাকো!

সবাই জানে অভ্যেস গড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে, সময় নিয়ে। যেমন ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট গুবরেকে একটা লোহার ট্রের মধ্যে বসিয়ে বেঁধে রাখল তারের টুকরো দিয়ে, গুবরে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ছিঁড়ে ফেললে তারটা। ফের সন্তর্পণে তাকে বসিয়ে বাঁধা হল। ফের নীরবে তার কেটে সে অভিনন্দন জানাবার মতো করে লেজ নাড়তে লাগল।

কে হারে কে জেতে? কে বেশি নাছোড়বান্দা?

শেষ পর্যন্ত একদিন দেখা যায় গুবরে বাঁধাছাঁদা হয়ে বসেই থাকছে; দাঁত আর শানাচ্ছে না।

এবার আসল কাজে নামা যেতে পারে। প্রফেসর ডাক্তারদের ডাকলেন — সে কথা ঘোষণা করবার জন্যে। সংক্ষিপ্ত এ সভাটা দেখে মনে হবে যেন যুদ্ধের আগে সেনানায়কদের সাক্ষাৎ। নিজের নিজের কর্তব্যটা সবারই জানা আছে, তবু প্রধান সেনাপতির নির্দেশ শোনার পর সে কর্তব্যটাকে আরো সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া আর কি। দায়িত্বশীল একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, ভুল যেন তাতে না হয়।

প্রফেসর বললেন, 'আমার বিশ্বাস, নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা খুব শিগগিরই আমাদের বলে বসবেন "ব্যোমযান তৈরি!" কিন্তু আমাদের মঞ্জুরি না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ তাতে উঠবে না। প্রাণী

সমেত নতুন রকেট ছাড়তে হবে আমাদের। এই সন্ধানীদের সামনে পাঁচটি বিপদ: প্রথম — রকেট ইঞ্জিন চলার সময় কম্পন, দুই — রকেট চালু ও বন্ধ করার সময় ত্বরান্বয়নের ভয়ংকর চাপ, তিন — অবাধ উড্ডয়নের সময় ভারহীনতা, চার — অতি উচ্চে বায়ুমণ্ডলের অভাব এবং সর্বশেষে, মহাজগতে বিপজ্জনক বিকীরণ। মহাকাশযাত্রীর এই পাঁচটি অদৃশ্য শত্রু, দেহকোষের ওপর তাদের প্রতিক্রিয়ার শক্তিটা আমাদের নিখুঁত করে জানতে হবে। এবার কাল থেকে ওড়ার জন্যে তৈরি করতে হবে কুকুরগুলোকে। যতটা সম্ভব সব কিছুই সবই করা চাই, এইখানেই পরীক্ষা শুরু হোক ওদের।'

তাহলে শুরু...

সেদিন সকালে জানলা দিয়ে দেখা গেল নরম শাদা বরফ পড়েছে। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ অন্যদিনের চেয়ে বেশি সময় কাটাল খাঁচাগুলোর কাছে, কুকুরদের সঙ্গে। খেঁকুরের কাছে গিয়ে আদর করে বললে:

'কেমন মেজাজ আজ? কানদুটো দেখেই বুঝছি ভালো। শীতকালটা বেশ ভালো লাগে তাহলে? কবি পুশ্‌কিন বলেছেন, "শীতকাল? স্লেজে চেপে সগর্বে নতুন পথ কাটে চাষী..." নতুন পথ কাটা বৈকি। আমরাও আজ শুরু করব। শুরু! শুরু!' মাথার চুল ঝাঁকিয়ে সগভীরে বললে সে, 'খেঁকুরে, খোকন, গুবরে — চলো যাই!'

প্রথম তুষারপাতের এই সকালটায় সেদিন খেঁকুরের সামনে যে দরজা খুলল, সেটা যেন নতুন, কঠিন তবু আনন্দের এক জগতের দরজা।

বেশ খাপি, সবজে রঙের ইজের আর ফতুয়া পরানো হল ওদের। ভালিয়া পরালে। বোতাম এঁটে দিয়ে ভারি তৃপ্ত হল তার — স্যুটগুলো সে নিজেই কেটে সেলাই করেছে কিনা। কুকুরগুলোকে দেখাল যেন বাচ্চা

প্যারাশ্যুটিস্ট; নতুন পোষাকে বিশেষ ভরসা না পেয়ে তারা কিন্তু চলা ফেরা করতে লাগল সন্তর্পণে, পাগুলোকে একটু বেশি রকম ফাঁক করে।

'এই বার তোরা হলি খাঁটি এক্সপেরিমেণ্টার,' খুশি হয়ে বললে ভালিয়া। এক্সপেরিমেণ্টারদের বসানো হল নতুন এক ধরনের ট্রে'র উপর, নতুন ধরনের বেল্ট দিয়ে বাঁধা হল তাদের। পোষাকের তলে ওদের লুকানো রইল ক্ষুদে ক্ষুদে সব যন্ত্র — সেন্সিং ডিভাইসেস। বানানো খুব সোজা। ছোট্ট কাগজের প্যাকেটের মধ্যে সরু তারের স্পাইরেল অথবা কার্বন পাউডার ভরা রবারের টিউব। কাগজ আর স্পাইরেল, গুঁড়ো আর টিউব — ওই কিন্তু এক সূক্ষ্ম যন্ত্র, বুক বা পেশী থেকে এতটুকু বিদ্যুৎপ্রবাহ বেরলেও তা ধরা পড়বে তাতে, আর চালান হয়ে যাবে সবুজ পর্দাটায়। এক্ষুনি যন্ত্র চালু করা হবে, কুকুর বসানো ট্রেটা কাঁপতে থাকবে আর পর্দাতেও কাঁপতে থাকবে আলোর হাল্কা তরঙ্গ আর ছোটো ছোটো বিদ্যুৎ ঝলক, ফোটোর ফিতেয় তখন একটা আলোর রেখা ছুটোছুটি করে দেখিয়ে দেবে আঁকাবাঁকা একটা লাইন। শুরু হবে সেন্সারের নিখুঁত রিপোর্ট। হার্ট, নিশ্বাস, রক্তের চাপ — সব কিছুরই রিপোর্ট মিলবে তাতে।

'সেন্সার' এই যুৎসই নামের সহজসরল যন্ত্রটি ভারি সূক্ষ্ম। ঘাস কী ভাবে বাড়ছে সেটা অনুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। কিন্তু সেন্সারে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়বে। ঘাসের সঙ্গে লাগানো হল একটা সূক্ষ্ম তার, চোখে ধরা না পড়লেও সেটায় টান পড়বে আর চাঞ্চল্য জাগবে বিদ্যুৎপ্রবাহে। তাতে মাপ যন্ত্রের কাঁটাটা নড়বে আর একেবারে সঠিকভাবে মাপা যাবে: ঘাসের দৈর্ঘ বাড়ল এক মিলিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ! এই হল আমাদের হুঁশিয়ার সেন্সার।

খেঁকুরেকে যে ট্রেটায় বসান হয়েছিল সেটা ঝাঁকি দিয়ে কী ভাবে কাঁপতে থাকল সেটা ভালিয়া দেখল। দাঁত দেখাল খেঁকুরে, পিছনের দিকে কান চেপে টান টান হয়ে উঠল। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ তখন তার যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত। ভাইব্রেশনে কী রকম ভয় পেয়েছিল খেঁকুরে সেটা সে দেখেনি।

'নে, বসে থাক লক্ষ্মী আমার, কী হয়েছে, ভয় কী,' দরদ দিয়ে ফিসফিস করে বললে ভালিয়া।

মোটরের গুঞ্জনে তার কথা শোনা না গেলেও খেঁকুরে কিন্তু কিছু সহজ হয়ে এল। কাঁপতে থাকা ট্রেটা ছেড়ে পালাবার জন্যে সে কিন্তু আর চঞ্চল হল না: ট্রেতে শান্তভাবে বসে থাকাটা তার আগেই অভ্যেস হয়ে গেছে।

সেন্সার থেকে যন্ত্রে কিন্তু খবর গেল যে তার নাড়ি দ্রুত চলছে, সবজেটে পর্দায় ছোটো ছোটো বিদ্যুতের চঞ্চলতা দেখল ডাক্তাররা।

বাড়ির দাওয়ায় শুয়ে থাকা বিশ্বস্ত চৌকিদারের মতো খেঁকুরে এই অস্বস্তি সবই সহ্য করে গেল। ট্রের কাঁপুনি যখন থামল, বেল্ট যখন খুলে দেওয়া হল, তখন সে কয়েকমিনিট জিভ বার করে জিরিয়ে নিলে মেঝের ওপর, তারপর ঠিক আগের মতোই খাড়া হয়ে দাঁড়াল, যেন কিছুই হয়নি।

'সাবাস!' তারিফ করে ভালিয়া তার মুখে একটা লজেন্স গুঁজে দিলে।

গুবরে কিন্তু ট্রের ওপরে করুণ সুরে ডাকতে শুরু করেছিল; তারপরেও বহুক্ষণ তার কাঁপুনি থামেনি। এক টুকরো চিনি খাওয়ার পরেই কেবল তার ধাত ফেরে।

আর পরীক্ষার পরে খোকন কেবল জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে, আর জ্বলজ্বলে বড়ো বড়ো চোখে অবাক হয়ে তাকাতে থাকে সবার দিকে।

'জানেন, ও কী ভাবছে এখন?' আশেপাশের লোকদের দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করল ইওলকিন, 'ভাবছে, কাল যে ইস্ক্রুপটা চুরি করেছিল, সে তো সাগ্রহেই স্বীকার করতে রাজী। দোষ তো মেনেই নিয়েছে, উচিত শাস্তি নিতেও আপত্তি নেই। কিন্তু সাধারণ একটা ইস্ক্রুপের জন্যে অমন ধারা ঝাঁকুনি, এ কখনো আশা করেনি।'

সবাই হেসে উঠল। প্রফেসর বললেন:

'তাহলেও পয়লা নম্বর শত্রু এই ভাইব্রেশন বা কম্পন অথবা খোকন যা ভাবছে ঝাঁকুনি — সেটা সবচেয়ে দুর্বল শত্রু। জেট প্লেনের বৈমানিকদের পক্ষে এটা বরং বেশি ভয়ঙ্কর — তাকে বলে "ফ্ল্যাটার"। প্লাইউডের পাতের মতো থরথর করে কেঁপে উঠতে পারে প্লেনের পাখা। কেবিনের মধ্যে বৈমানিককে একেবারে ধাক্কা দিয়ে এদিক ওদিক করতে থাকবে। টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে প্লেন... রকেটের কম্পনে ধ্বংসের ভয় নেই, দরকার শুধু অভ্যেস করে নেওয়া।'

অভ্যেস করিয়ে নেওয়ার পালা চলল প্রতিটি দিন। বাঁধাছাঁদা পরীক্ষাধীন বাচ্চাদের কাঁপাত যন্ত্রে; আর শান্ত হয়ে বসে থাকত ওরা, কেবল জিভটি বার করত, ট্রের সঙ্গে সে জিভও কাঁপত টুক টুক করে।

সবজেটে পর্দার দিকে চাইল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। রেখার রহস্যময় ছুট দেখে খুশিই হল সে।

আর সবকটি মোটর যখন গোঁ গোঁ করছিল, তখন ওদিকে চুপি চুপি গান গাইছিল ভালিয়া আর ভাবছিল প্যাকেট যন্ত্র, টিউব আর বলের কথা। এখন খেঁকুরের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছে ওগুলো, পরে ওর সঙ্গেই যাবে রকেটে, জীবন্ত কোনো সাক্ষীর চেয়ে অনেক নিখুঁত করে জানিয়ে দেবে, কী কষ্ট সইতে হয়েছে মহাকাশযাত্রীদের।

“ফুটবলের ডাক্তারের জায়গা খেলার মাঠে। জাহাজের ডাক্তার জাহাজে। সার্জেন রোগীর পাশে। আর মহাজগতের ডাক্তার — তার যন্ত্রের কাছে।” ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের কথাগুলো মনে পড়ল তার, দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে, ‘আর আমি? ইজের ফতুয়া সেলাই করি, কুকুরগুলোকে পরাই আর খুলি? কোনো একটা আবিষ্কারও করি না।’

দিন কয়েক পরে কুকুরদের আনা হল একটা গোল ঘরে। ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে একটা যন্ত্র — ঠিক একেবারে নাগর-দোলার মতো: মাথাওয়ালা একটা থামের মতো, চারপাশে ঠেকো, থামের উপর ফ্রেম, ফ্রেমের সঙ্গে দুটো কেবিন। নতুন বিপদের সঙ্গে কুকুরদের পরিচয় সাধনের জন্যে এই যন্ত্র। নামটা তার সেণ্ট্রিফিউগ। ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড একটা গতি এসে যায় সেণ্ট্রিফিউগে, কৃত্রিমভাবে উদ্ভব হয় অদৃশ্য চাপের।

ডাক্তার দ্রোনভ আর তার সহকারী জিনা খেঁকুরেকে তার ট্রে সমেত সেণ্ট্রিফিউগের দোলনা কেবিনে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

‘শুয়ে থাক, লেজ নাড়াসনে,’ হুকুম দিল ডাক্তার।

গোঁ গোঁ করে উঠল মোটর, নড়ে উঠে চলতে শুরু করল দোলনা। দেয়ালটা যেন এগিয়ে এল খেঁকুরের দিকে, ছুটে গেল একেবারে কাছ ঘেঁসে, সবকিছু একাকার হয়ে পরিণত হল একটা শাদা পর্দায়। বাতাসে উড়তে লাগল গায়ের লোম, ঠাণ্ডা হয়ে এল নাক, আর খেঁকুরের মনে হল এমন জোরে চাপ পড়তে থাকল যে মাথা নড়ানও অসম্ভব। উড়তে উড়তে দোলনাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে কাত হয়ে রইল। যন্ত্রের নিচে টেলিভিজন আর ইনস্ট্রুমেণ্টের স্ক্রীনের কাছে বসেছিল ডাক্তার আর ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তাদের কাছে মনে হল যেন দোলনাটা একেবারে দেয়ালের ওপর দিয়ে পিছলে চলছে।

সার্কাসে গোলকের মধ্যে মোটরসাইক্লিস্ট যে ভাবে খেলা দেখায়, তেমনি।

কেবিন যত জোরে ঘুরতে লাগল ততই যেন একটা অদৃশ্য দানব দোলনার সঙ্গে চেপে ধরল কুকুরটাকে। ওজন বেড়ে চলল তার। পাঁচ কিলোগ্রামের খেঁকুরে যেন প্রথমে হয়ে উঠল একটা বড়োগোছের দো আঁশলা, তারপর রীতিমতো একটা শিকারী কুকুর, শেষ পর্যন্ত একেবারে একটা ভেড়া-খেদানো কুকুর। অবিশ্যি চেহারা ওর তাই বলে বাড়েনি, বরং আরো যেন ছোটোই হয়ে উঠল: অতি ওজনের ভার তাকে চেপে ধরেছিল।

ইনস্ট্রুমেণ্টে দ্রোনভ দেখল: খেঁকুরের ওজন এবার তার সাতগুণে দাঁড়িয়েছে। টেলিভিজনে দেখা গেল মুখটা তার খানিকটা রোগা হয়ে গেছে। তার মানে রক্ত ওর এখন লোহার মতো ভারী। হার্টের পক্ষে কাজ চালানো এখন যে কী মুশকিল তা বোঝাই যায়; হার্টটাও যেন ঠিক ওই লোহাতেই তৈরি ...

স্টপ! মোটর থেমে গেল, ফ্রেমটা কিন্তু তখনো ঘুরছে। নিজেকে অসম্ভব হালকা লাগতে লাগল খেঁকুরের, মনে হল যেন হঠাৎ সে শূন্যে নিশ্চল হয়ে ঝুলছে। কেবিনটা কখন থেমে গেছে সে খেয়াল তার ছিল না।

'প্রাণটা যায়নি এখনো?' দোলনার দিকে তাকিয়ে রহস্য করে জিজ্ঞেস করলে দ্রোনভ।

প্রাণ যায়নি বটে! কিন্তু কী হাল হয়েছে বেচারার... ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, বোকার মতো চোখ মিটমিট করছে, লালা ঝরেছে প্রায় এক বাটি।

'সাবাস!' খেঁকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে বললে ডাক্তার, 'এই তো রাস্তার কুকুর, কী না সইতে পারে জীবনে! এমন কষ্ট সৌখীন কুকুরে কিন্তু সইতে
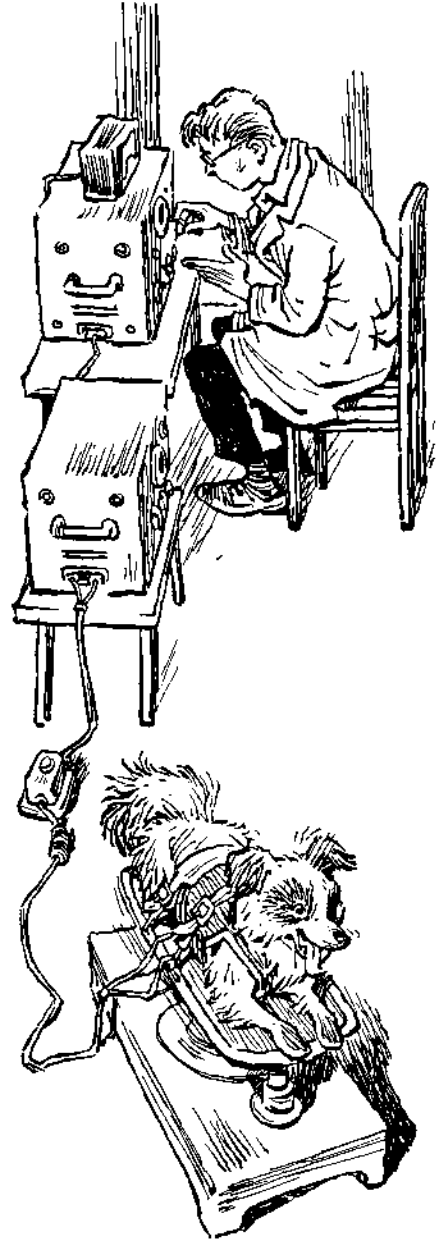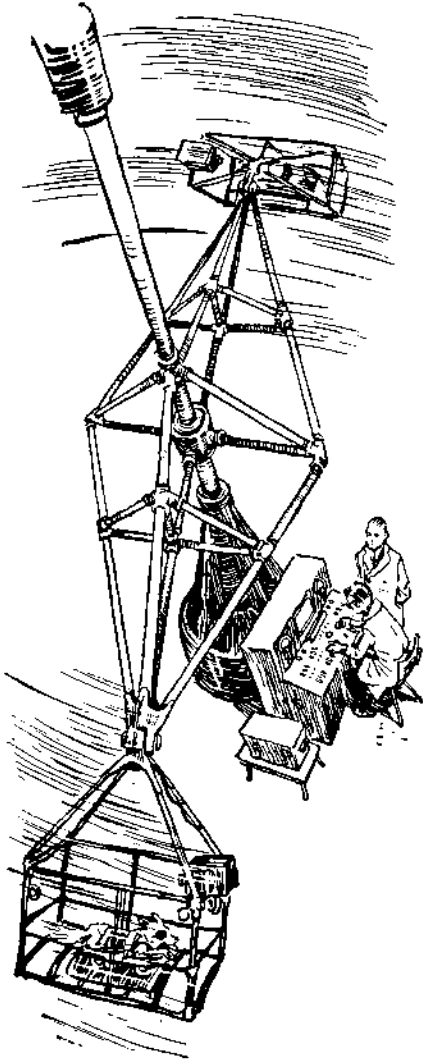
পারত না।' খে'কুরের দিকে ভালো করে নজর করে বলে চলল দ্রোনভ, 'আমি একটা পুড্‌ল্‌ কুকুর জানি, ভারি বুদ্ধিমান কুকুর — প্রতিভাধর। কিন্তু সব প্রতিভা ওর যত বাজে ব্যাপার নিয়ে: মনিবের জন্যে চটি এনে দেয় ঠিক। সেন্ট্রিফিউগ সইতে পারত না।'

'কালও সইতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'পারবে।'

পরের দিন যন্ত্রের রাগ যেন আরো বেশি, খে'কুরের পক্ষে আরো কষ্ট। মাথাটা সামনের দিকে করে সে শুয়ে ছিল দোলনায় আর ভার চাপে সবচেয়ে আগে মাথায়। রক্ত ছুটে যায় পায়ের দিকে। চোখ অন্ধকার হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে খে'কুরে।

পরের দিন তাকে শোয়ানো হল উল্টো দিকে। চোখে আঁধার নামার বদলে এবার লালচে পর্দা কেননা রক্ত সব ছুটে আসছে মাথায়। দেহের প্রতিটি কোষ চাপ দিচ্ছে পরের কোষের ওপর, আর রক্তটা দেহের মধ্যে সবচেয়ে সচল জিনিস বলে অতিভারের প্রচণ্ড চাপের অধীনস্থ হয় সেই আগে।

দ্রোনভ জানত কেবিনের মধ্যে কেমন লাগছে খে'কুরের। চোখে আঁধার দেখা, লালচে পর্দা দেখা, এ সব সে জানত। জানত নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এবং অ্যাক্সেলেরোগ্রাফ যন্ত্রের রেকর্ড দেখে। এ যন্ত্রে কাগজের ওপর অসমান বেড়ার মতো যে খোঁচা খোঁচা দাগ পড়েছে, তা থেকে বিজ্ঞানী টের পায় কুকুরটা কতখানি অতিভার সইল, অর্থাৎ ওজন তার বেড়ে উঠেছিল কতখানি, আর কত মিনিট বা সেকেণ্ড চলেছিল তার ক্রিয়া।

দ্রোনভ আরো জানত যে সবচেয়ে ভালো হয় যখন অদৃশ্য চাপটা চড়াও হয় বুক থেকে পিঠের দিকে, অথবা উল্টোভাবে পিঠ থেকে বুকের দিকে; আর সবচেয়ে খারাপ মাথাটা বা পাটা সামনের দিক করে ওড়া — জ্ঞান হারিয়ে যায় তখন।

তাহলেও কুকুরগুলোকে সব রকম অবস্থাতেই রেখে দেখল ডাক্তার। যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তার অবস্থা লক্ষ্য করে গুন গুন করে গান গাইছিল দ্রোনভ:

এটা এবং ওটা
ওটা এবং সেটা
জেনে নেওয়াই চাই।
অজানাটার ভাবী
আঘাত যত, সবই
করব রে যাচাই।

দ্রোনভের পাশে বসে জিনা ট্রেনিংরতদের ডায়েরি লিখে যাচ্ছিল। আর সবচেয়ে নিখুঁত রেকর্ডিং'এর কাজটা চলছিল যন্ত্রে — কুকুরের বুকে পিঠে, পাশ থেকে পেছন থেকে কত অতিভার চেপেছিল সব লেখা হয়ে যাচ্ছিল ফিতেয়।

শত শত মিটারের ফোটো ফিতের ওপর খোঁচা খোঁচা রেখার ওই রেকর্ডগুলো কেন নেওয়া হচ্ছে সে কথা জিনা দ্রোনভকে জিজ্ঞেস করেনি। নিজেই সে আন্দাজ করলে, "রেকর্ডগুলো তুলনা করে দেখতে চায় বোধ হয়। রকেট যখন ছাড়া হবে, তখন তার মধ্যেকার কুকুরের অবস্থার কথাও রেকর্ড হবে যন্ত্রে। সেই রেকর্ডের সঙ্গে এই রেকর্ড মিলিয়ে দ্রোনভ ধরতে পারবে কী ধরনের অদৃশ্য শক্তির কবলে পড়বে মহাকাশযাত্রী।"

এটা এবং ওটা
ওটা এবং সেটা...
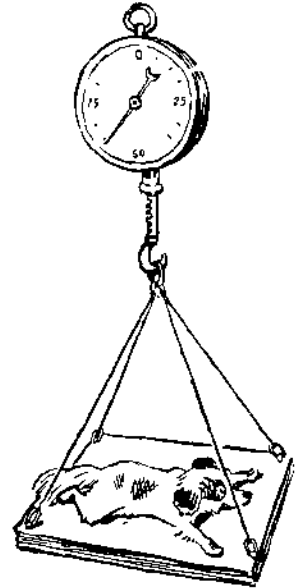
গেয়ে চলেছে আমুদে ডাক্তার। জিনা কিন্তু ইতিমধ্যেই গর্বে ভরে উঠেছে। এ'র মতো ডাক্তার আর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে চলেছেন হাজার হাজার। সেণ্ট্রিফিউগে শুধু কুকুর নয়, উঠল মানুষ, বৈমানিক। পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে দশ থেকে বারো গুণ ত্বরান্বয়ন সইল তারা অক্লেশে। সুবিধাজনক পোজ নিত তারা — অতিভারের চাপটা আসত হয় পিঠে নয় বুকে। আর একজন পরীক্ষাধীন — জিনা এটা শুনেছিল প্রফেসরের রিপোর্ট থেকে — ডুবুরির পোষাক পরিয়ে সেণ্ট্রিফিউগের উপর বাঁধা জলভর্তি টবের মধ্যে মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে শোয়ান হয়েছিল তাকে আর কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তার ত্রিশ গুণ ওজন সহ্য করছিল সে।

অবসর সময়ে দ্রোনভ তার সহকারিণীকে গল্প করে শোনাত সেণ্ট্রিফিউগের কেবিনে চাপানো হয়েছে কত প্রাণীকে — বাঁদর, ব্যাঙ, একোয়ারিয়মের মাছ, এমন কি অনুজীবসত্তা পর্যন্ত। বাঁদরের প্রতিক্রিয়াটা হয় মানুষের মতো। একোয়ারিয়ম চাপানো হয়েছিল সেণ্ট্রিফিউগে, স্পীড বাড়ার পর ক্ষুদে ক্ষুদে মাছগুলোর ওজন দাঁড়ায় বড়ো বড়ো রুইকাতলার মতো। ভাসমান ব্যাঙ সমেত ওঠানো হয় জলের টব, যন্ত্র ছোটানো হয় আরো জোরে আর এক একটা ব্যাঙের ওজন দাঁড়ায় দেড়শ কিলোগ্রাম করে। আর অণুজীবসত্তা নিয়ে দোলনা কেবিন ঘুরতে থাকে একেবারে পাগলার মতো। ওজন তার বেড়ে ওঠে দুশ হাজার গুণ। তাহলেও অণুজীবসত্তার কিছু হয় না, কারণ জলের মধ্যে ছিল।

দ্রোনভ বলে, 'শুনতে যতই আশ্চর্য লাগুক, যে কোনো বর্মের চেয়ে কিন্তু জলেই অদৃশ্য শক্তির হাত থেকে ভালো বাঁচা যায়। তার মানে এমন একটা কেবিন বা পোষাক উদ্ভাবন করা যায়, যাতে আঘাত বা বর্ধিত ওজন থেকে বাঁচা সম্ভব। আগেই সে সম্বন্ধে লিখে গেছেন ৎসিওলকভস্কি। কিন্তু যতদিন তা উদ্ভাবন করা না হচ্ছে, ততদিন আমাদের চারপেয়ে সন্ধানীদের তালিম দিয়ে যেতে হবে যাতে মহাজগতের নানা চমকের জন্যে তৈরি থাকতে পারে তারা।

প্রতিদিন খেঁকুরে পরিণত হতে লাগল একটা ভারী কুকুরে তারপর ফের যে কে সেই। কেন যে এটা করা হচ্ছে তা সে বুঝত না, কিন্তু বাধ্যের মত শুনত। দোলনা কেবিন যেই স্টার্ট নিত, অমনি খেঁকুরে নিরীহের মতো থাবার ওপর মাথাটি রেখে অদৃশ্য শক্তির চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করত। ওর ভাব দেখে মনে হত যেন বলছে — শেষ পর্যন্ত যে কোন অদ্ভুত ব্যাপারও তো অভ্যেস হয়ে যায়।

এর পর খেঁকুরের পরীক্ষা শুরু হল নিরেট করে বন্ধ একটা ছোট কেবিনে, তৈরি হতে লাগল তিন নম্বরের শত্রুর মোলাকাত করতে — এ শত্রু হল মহাজাগতিক শূন্য। দিন কয়েক ধরে সে কাউকে দেখতে পেত না, নির্জনতায় অভ্যস্ত হল সে। খাবার দেওয়া হত বিশেষ একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে।

খাঁচায় ফিরে আসার পরও এই সব নতুন অনুভূতি পীড়িত করত খেঁকুরেকে। ঘুমের মধ্যে সে তার পা নাড়াত, কান খাড়া করত, চাপা স্বরে ডাকত। রাত্রে ডিউটির সময় ভালিয়া খাঁচার কাছে আসতেই প্রথমে তার একটা কান, পরে দ্বিতীয় কানটা কেঁপে কেঁপে, টান টান হয়ে খাড়া হত, ঘুরে যেত যে দিকে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেই দিকে। সজীব হয়ে উঠে মেঝের ওপর আস্তে আস্তে টোকা মারত লেজটা। চোখের পাতা মেলে পরিচিত দৃষ্টিতে দেখত খেঁকুরে।

খাঁচার ফাঁক দিয়ে খেঁকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেল ভালিয়া। তারপর ভোর পর্যন্ত শান্ত হয়ে ঘুমল খেঁকুরে।

অসফল যাত্রা

সন্ধ্যায় যখন কুকুরদের বিশ্রামের সময় তখন ভারি একঘেয়ে লাগত খাঁচার মধ্যে। আড়িমুড়ি ভাঙত কুকুরগুলো, পা টান টান করে দিত। প্রথমে চুপি চুপি হাই উঠত একটা দুটো। এক মিনিট পরে খোলাখুলিই হাই তুলত সকলে। কেউ ডেকে উঠত একটু, কেউ হাঁচত, করুণ সুরে গান ধরত কেউ।

কিন্তু যেই এসে দাঁড়াত ডাক্তারটি, অমনি মেজাজ বদলে যেত সকলের। বন্ধুর মতো আলাপ করত মানুষটা, রসিকতা করত, খেতে দিত চিনি।

সবচেয়ে মজার গল্প হত খোকনের সঙ্গে। মাথাটি একটু হেলিয়ে বেশ মনোযোগ ফুটিয়ে ভালো মানুষের মতো তাকাত খোকন।

ডাক্তার বলত, 'ছি ছি ছি খোকন, কী হচ্ছে এসব বলো তো।'

"কী হচ্ছে?" নিরীহের মতো চোখে জিজ্ঞেস করত খোকন।

'কাল কোনো বকুনির কাজ করোনি, সেণ্ট্রিফিউগে বেশ ভালোই দেখালে...'

"সে আর বলতে," কালো নাকটা তুলে সগর্বে যেন সায় দিত খোকন।

'কিন্তু আজ? ল্যাবরেটরিতে যেতে না যেতেই আমার টেবলের ওপর লাফিয়ে উঠে ভিজিয়ে দিলে কাগজপত্রগুলো?'

"সে কী?" খোকনের সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠত ভারি অবাক একটা ভাব।

'তা করতে হলে কি টেবলের ওপরেই উঠতে হবে?' জিজ্ঞেস করল ভুক্তভোগী।

"নিশ্চয় নয়," বোদ্ধার মতো লেজটা নড়ত খোকনের।

'আমার একটা চেনা পুডল কুকুর আছে,' বলে চলত ডাক্তার, 'ভারি বুদ্ধিমান কুকুর। অমন ব্যাপার সে কদাচ করে না, যদিও থাকে সাধারণ বাসা বাড়ির ফ্ল্যাটে। আর তুই খোকন—একেবারে ইনস্টিটিউটের মধ্যে, ছি ছি!'

যত বেশি "ছি ছি", ততই ঘন ঘন চোখ মিটমিট করত খোকন। আস্তে আস্তে উঠে সে কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, ঝোলা লেজটি ফিরিয়ে রাখত সকলের দিকে।

অলক্ষ্যে কেটে যেত সন্ধ্যা, ঘুম নেমে আসত চোখে।

রোজ রাত্রে ঝুপঝুপ করে পড়ত বরফ, আর ক্রমেই বাড়তে লাগল নিটোল বরফের স্তূপ, উঁচু হয়ে উঠতে লাগল জানলার দিকে। বরফের স্তূপের ওপর পা ফেলে ফেলে যেদিন নববর্ষ এসে ঢুকবে ঘরে, তার আর বেশি বাকি নেই।

একদিন ট্রেনিঙের বদলে খেঁকুরে ও আরো দুটি কুকুর, ফুটকি আর খোকন, আঙিনায় বরফের ওপর দৌড়াদৌড়ি করার অনুমতি পেল। পরে ওজন নেওয়া হল তাদের, রক্ত পরীক্ষা

হল, এক্‌স্‌রে ঘরে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হল বুকের। এসবই আগেও হয়েছে। কিন্তু এবার যেন ডাক্তারদের মধ্যে ভারি একটা সমারোহ।

যে ঘটনাটার জন্যে ইনস্টিটিউটে এতদিন ধরে তোড়জোড় চলেছে, এবার সেটা ঘটার পালা।

'ভালিয়া ফুটকির রক্তের রিপোর্টটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখুন। স্বাভাবিক থেকে ওর খানিকটা ব্যতিক্রম কেন?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

'ভারি আশ্চর্য,' ভালিয়া বললে, 'খাবার ব্যবস্থায় অনেক জোর দেওয়া হয়েছে, ভালোই ঘুময়, অথচ এ কী!'

ফুটকির অসুখ করেনি তো?

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ পরীক্ষা করে দেখল কুকুরটাকে। তারপর চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না।

আধঘণ্টা পরে ভালিয়া জানালে, 'ধরতে পেরেছি কী হয়েছে। গুবরে ওকে কামড়ে দেয়। জিনা ভরোবিওভা একটা লজেন্স দিয়েছিল ফুটকিকে, গুবরে সেটা কেড়ে নেবার জন্যে ছুটে যায়। কিন্তু ভয় নেই, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ইওলকিন ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। ভালিয়া কিন্তু ভারি খুশি এই জন্যে যে ফুটকির কোনো অসুখ করেনি; খুবই একটা সাধারণ ব্যাপারই ঘটেছে।

সেদিন রাতে শীতের মাথায় কী খেয়াল চাপল, জানলার কাচে বরফের নক্সা যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলল সে।

সকালে ইওলকিন খাটো ওভারকোট, ফার টুপি আর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ফেল্ট বুট পরে খেঁকুরে ফুটকি আর খোকনকে বেল্ট বেঁধে নিয়ে এল আঙিনায়। সেখানে তাদের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল তিনজন ডাক্তার। আর জানলা দিয়ে দেখছিল সমস্ত সহকর্মীরা। ভালিয়া, জিনা, দ্রোনভ, প্রফেসর এবং আরো যত লোকের সদয় হাত দিয়ে এই পরীক্ষাধীনেরা এতদিন গেছে তারা সবাই বিদায় জানাল তাদের। হাত নাড়ল তারা, জানলার ওপাশ থেকে কেউ বা চেঁচিয়েও উঠল।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি 'পাবেদা' মোটরগাড়ি। কুকুরগুলোকে নিয়ে ইওলকিন উঠল একটা গাড়িতে, ডাক্তাররা উঠল অন্যটিতে। যাত্রা শুরু হল একেবারে অটুট নীরবতায়, বিশেষ রকম সমারোহের মুহূর্তে সাধারণত যা হয়। গুঞ্জন উঠল ইঞ্জিন থেকে। তরতরিয়ে গাড়ি ছুটল।

মোটরের যখন দরজা খোলা হল, তখন চারিদিকের খেলামেলায় অবাক হয়ে গেল এই চারপেয়ে দলটা। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে ওরা কিছুতেই বুঝতে পারল না ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট,

বলতে কি গোটা শহরটাই কোথায় উধাও হয়ে গেছে। সামনে তাদের কেবল বরফে ঢাকা মসৃণ প্রান্তর, তার ওপর জেগে আছে কয়েকটা ডানাওয়ালা যন্ত্র।

"এরোপ্লেন ওরা এই প্রথম দেখল কিনা," শঙ্কিত হয়ে ভাবল ইওলকিন, "তাতে আবার খোলা মাঠ ... ফের ওদের ঐ ভবঘুরে ভাবটা জেগে উঠবে না তো? ঘেউ ঘেউ শুরু করবে না তো?"

না ডাকল না। শান্তভাবেই গেল এরোপ্লেনের কাছে, হালকা পায়েই উঠল সিঁড়ি বেয়ে।

যাত্রী যারা, তারা হল রকেট ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ান, কনস্ট্রাক্টর, আগেই বসে ছিল সিটে — খেঁকুরে, ফুটকি আর খোকনকে তারা অভিনন্দিত করল এমন সোরগোল তুলে যে ওরা বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিলে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের পায়ের কাছে। মোটর গর্জন করে উঠল, প্লেন দুলে উঠে আস্তে আস্তে স্টার্ট নিল। তারপর দাঁড়িয়ে যেন বা মোটরের শব্দটা শুনল একটু, আর ছুটতে শুরু করল সবেগে, প্রতি সেকেন্ডে স্পীড বাড়তে বাড়তে যাত্রীদের অলক্ষ্যে মাটি ছেড়ে উড়তে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে বিশেষ নির্দেশে বাধ্য হয়ে অবতরণ করতে হল বিমানকে — রেডিওয় খবর এল যে সামনে ভয়ানক তুষার ঝটিকা শুরু হয়েছে। যাত্রীরা আর বিমানের খালাসীরা গিয়ে উঠল এরোড্রোমের অনতিবৃহৎ হোটেলটায়। অচিরেই বাড়িটার চারধার ঘিরে শুরু হল বরফের ঝাপটা, ওড়বার মাঠ ঘাট সারা দুনিয়া যেন হারিয়ে গেল দৃষ্টি থেকে।

সকালেও দেখা গেল তুষারের উন্মাদ নৃত্য। দিনটা ছিল ৩১শে ডিসেম্বর। সবাই ভাবল,
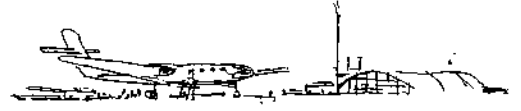
ছোট্ট হোটেলটায় নববর্ষ উদ্‌যাপন করা যাবে, কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত খবরে মুখ আঁধার হয়ে গেল সবার: আবহাওয়ার কারণে রকেট ছাড়া হবে না।

মস্কোয় ফেরা যেতে পারে হয় ট্রেনে করে, নয়ত তুষার ঝটিকা থামলে বিমানযোগে। জানলা দিয়ে আবহাওয়ার হাল দেখে মস্কোবাসীরা রায় দিলে, "ট্রেনই ভালো।" গোছগাছ শুরু হল।

খে'কুরে, খোকন আর ফুটকির পরামর্শ চাইল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, 'কী করা যায় এখন? মাত্র এক ঘণ্টা সময়, বুফে বন্ধ, এদিকে রাক্ষসের মতো ক্ষিদে পেয়েছে। সুটকেস এখানে রেখে দিয়ে তোদের সঙ্গে নিয়ে যাব ভোজনালয়ে? উ'হু, তোদের ঢুকতে দেবে না... নাকি তোদের এখানে রেখে সুটকেস নিয়ে ছুটব খাবারের সন্ধানে? উ'হু, ফেরার সময় হবে না... তাহলে এই করা যাক! সুটকেস সঙ্গে নিয়েই সবাই চল যাই ভোজনালয়ে। যা হবার হবে!..'

ভোজনালয়ে ওভারকোট রাখার লোকটি সন্দিগ্ধ কটাক্ষপাত করলে কুকুরগুলোর দিকে, কিন্তু চেন বাঁধা আছে দেখে কিছু বললে না; সুটকেসটাও রাখতে রাজী হল।

ওয়েট্রেস টেবলের কাছে ছুটে আসতে গিয়ে আর একটু হলেই বসে থাকা কুকুরগুলোর গায়ে পা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল আর কি। উবু হয়ে বসে তিনটি 'সোনামণির' গায়েই হাত বুলিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলে সে।

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের জন্যে সে সুপ এনে দিলে প্লেটে আর কুকুরগুলোর জন্যে লোহার বাটিতে। প্রথম সুপটা দেওয়া হল টেবলেই, বাকিগুলো সরাসরি মেঝের ওপর।
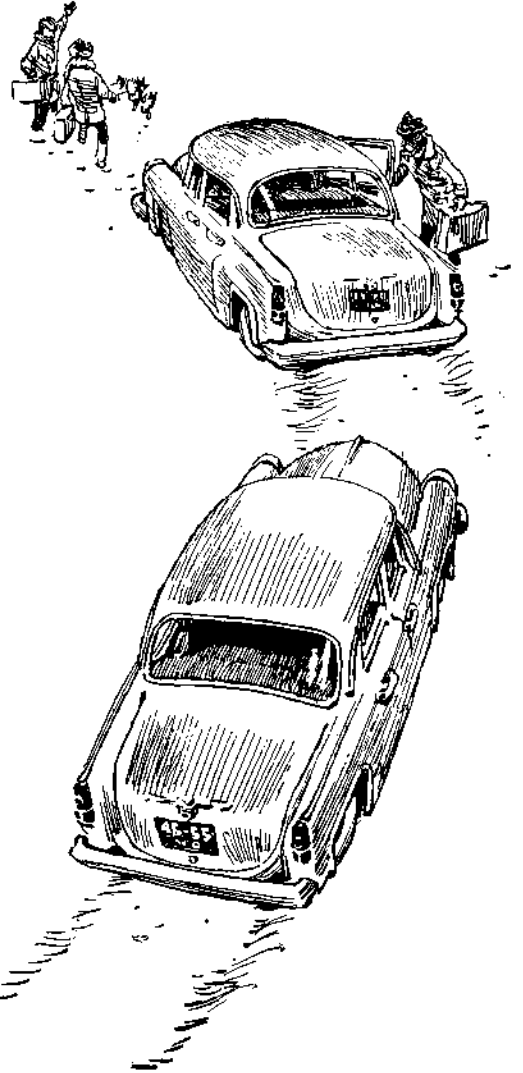
লোহার বাটিতে যবের স্যুপ উচিত মতোই ঠান্ডা। বুদ্ধিমান বাবুর্চি তার মধ্যে অন্য কোর্স থেকে কিছু হাড়ও ফেলে দিয়েছিল। ডিনারের মতো ডিনার হল বটে!

ট্রেন ধরা গেল একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। কুকুর সমেত ডাক্তার ছুটে গেল ৮ নং ওয়াগনের দিকে। কনডাক্টর টিকিট চেক করে ফিরিয়ে দিয়ে কুকুরবাহী যাত্রীটিকে কড়া গলায় বললে:

'ওহে ছোকরা, তিনটে কুকুর সঙ্গে নেওয়া চলবে না। রেগুলেশনে আছে ওয়াগনে দুটো কুকুরের বেশি নয়। কোনো উপায় নেই।'

ট্রেন দাঁড়ায় মাত্র দু মিনিট, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ তা জানলেও ধৈর্য না হারিয়ে শান্তভাবে বললে:

'মাপ করবেন, দুটো ওয়াগনে ভাগাভাগি হওয়া আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়, তাই রেগুলেশনটা ভাঙতেই হচ্ছে।'

এই বলে সে স্যুটকেস উপরে ঠেলে দিয়ে প্রথমে খোকন, তারপর ফুটকি আর শেষে খেঁকুরেকে তুলে দিলে। ছেড়ে দিল ট্রেন।

ওয়াগনটা 'কুপে' ওয়াগন নয়, লোকে একেবারে ভরপুর। তিনটে মনোরম কুকুর নিয়ে লোকটা নিজের সিটের দিকে এগুতেই খুশি আর কৌতূহলের একটা কোলাহল উঠল। হঠাৎ কোথা থেকে এমন ছেলে মেয়ে জুটে গেল যে মনে হল যেন সব বাক্স প্যাঁটরা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ জায়গা নিয়ে বসতে না বসতেই পাশের একটা বুড়ো তার ফেল্ট বুট আর খাটো ওভারকোটের দিকে কটাক্ষপাত করে প্রশ্ন করতে শুরু করলে:

'আপনি শিকারী বুঝি? কিন্তু মাপ করবেন, এমন বেজাত কুকুর রেখেছেন যে? নাকি ভাল্লুক শিকারে বেজাত কুকুরেও চলে? এস্কিমো কুকুরের চেয়ে বিশেষ খারাপ হয় না?'

ইচ্ছা থাক না থাক শিকারের গল্প চালাতে হল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে, ছেদ যা পড়ল সে শুধু কুকুরগুলোকে মাঝে মাঝে যথাস্থানে বসিয়ে রাখার জন্যে। বুড়োকে তো আর বলা যায় না যে এরা সাধারণ ভবঘুরে কুকুর নয়, মহাকাশযাত্রী। বিশ্বাসই করত না যে অমন সব কেউকেটারা চলেছে নাকি এক সাধারণ ট্রেনে।

শিকারের গল্প এমনই দীর্ঘ হল যে মস্কো পর্যন্ত ফুরল না।

স্টেশনে নেমে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ অবাক হয়ে দেখলে ঘড়িতে বারোটা বাজতে কেবল আধঘণ্টা বাকি।

সহচরদের সে জানালে, 'নববর্ষটা আমার বাড়িতেই উদ্‌যাপন করা যাবে। সসেজ খাইয়ে শুইয়ে দেব তোদের।'

বাড়িতে ওরা পৌঁছল ঠিক নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে। খুশি হয়ে উঠল সবাই — ইওলকিনের বৌ, মা, আর আটবছরের ছেলে সাশা। একে একে সবাইকে চুমু খেল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, তারপর একসঙ্গে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বললে:

'কী চমৎকার গন্ধ ছাড়ছে নববর্ষের ফার গাছ থেকে!'

আর খেঁকুরে, খোকন আর ফুটকির কথা যদি ধরি, তবে বলতেই হবে যে ওদের কাছে সবচেয়ে চমৎকার বলে মনে হয়েছিল কিন্তু সসেজের গন্ধটা। সে সসেজ সানন্দে লেহন করতে লাগল তারা। তারপর ক্ষিদে ঠাণ্ডা হতে খেলা জুড়ল সাশার সঙ্গে, সফরের কথা আর একটুও মনে রইল না।

সকালে ইওলকিন কুকুরদের নিয়ে এল ইনস্টিটিউটে। দেখা গেল ওদের খাঁচায় এসে আড্ডা গেড়েছে ভেটেরনারি কেন্দ্র থেকে পাঠানো নতুন বেজাতেরা। পর্যটকদের জায়গা হল অন্য একটা কামরায়, একটা অনতিবৃহৎ খাঁচার মধ্যে তিন জন সবাই। মোটেই প্রীতিকর হল না ব্যবস্থাটা। বিশেষ করে এই জন্যে যে কামরায় খালি খাঁচা আরো একটা ছিল।

কিন্তু সে খাঁচা খোলার কোনো লক্ষণ দেখালে না ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। ফাঁকা খাঁচাটার সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে পরিচিত ফলকটার দিকে সে তাকাল একবার, তারপর চলে গেল।

ফাঁকা খাঁচাটার ওপরে লেখা ছিল: "লাইকা থাকত এখানে।"

লাইকা থাকত এখানে
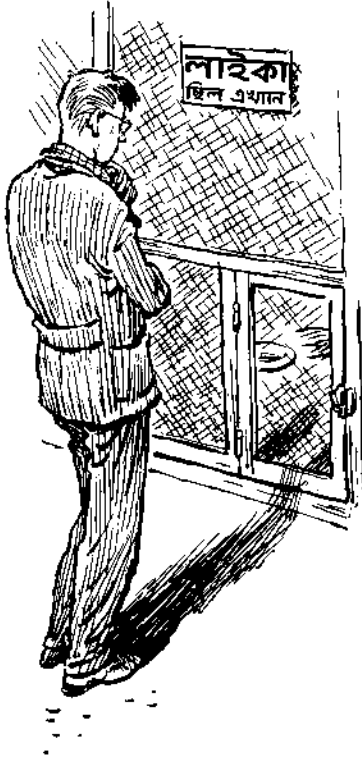
ফাঁকা খাঁচাটার কথা বলতে হলে যেতে হবে একটু অতীতে, ১৯৫৭ সালে।

১৯৫৭ সালের ৩রা অক্টোবরটা ছিল একটা সাধারণ মামুলী দিনেরই মতো। স্কুলের ছাত্ররা গিয়ে বসেছিল ডেস্কে। মজুরেরা তাদের লেদ মেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে। বৈমানিকেরা বিমান চালিয়েছিল শব্দের চেয়ে বেশি দ্রুত গতিতে। সন্ধ্যায় শুতে যাবার সময় কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে পরের দিন এক নতুন যুগের সূত্রপাত হবে।

আর ৪ঠা অক্টোবর সকালে সারা দুনিয়া চঞ্চল হয়ে উঠল এক খবরে: পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে একটা রুপোলী গোলক! এই প্রথম মহাজাগতিক ক্ষেপণকটি বিশেষ বড়ো নয় — সকলেই জানে তার ওজন ৮৩·৬ কিলোগ্রাম, ব্যাস ৫৮ সেণ্টিমিটার — তাহলেও সবাই বুঝেছিল কী মস্ত একটা ঘটনা ঘটেছে। আগুন আয়ত্ত করার মতো ঘটনা। স্টিমইঞ্জিন উদ্ভাবনের মতো ঘটনা। প্রথম বিমান ওড়ার মতো ঘটনা। বৈদ্যুতিক বা পরমাণবিক তেজ আবিষ্কারের মতো ঘটনা।

সোভিয়েত সহকর্মীদের অভিনন্দন জানালেন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা। গর্বে বুক ফুলে উঠল মজুরদের — কী আশ্চর্য যন্ত্রই না সৃষ্টি হয়েছে তাদের সাধারণ হাতে! প্লেনের বৈমানিকেরা হিংসে করতে লাগল এ গোলকের মহাজাগতিক গতি দেখে — সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার! আগে তেমন গতি কল্পনাও করা কঠিন ছিল। আর ডেস্কের সামনে বসা স্কুলের ছাত্ররা তো তখনই কল্পনায় যাত্রা শুরু করে দিয়েছে সুদূর ব্রহ্মাণ্ডে।

গ্রহ তারার পথ খুলে গেল মানুষের! সে পথ গেছে অসীম মহাজগতে। আর তার শুরুটা হয়েছে লাল পঞ্চমুখী তারার দেশ থেকে।

'নতুন তারকা', 'উড়ন্ত তাজ্জব', 'সোভিয়েত চাঁদ' — চাঞ্চল্য সৃষ্টির মতো যতসই সব কথা খোঁজার চেষ্টা হল দুনিয়ার খবরের কাগজে। তারপর একটা নামে এসে থামল সবাই, 'স্পুৎনিক'! বেশ শুনতে এই রুশী শব্দটা। কমরেড শব্দটার মতো।

ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসতে লাগল।

'মস্কো, স্পুৎনিক। আমি মহাজগতে যেতে চাই।'

'মস্কো, স্পুৎনিক। মহাকাশযাত্রীদের নামের তালিকায় আমার নামটাও অন্তর্ভুক্ত করা হোক।'

'মস্কো, স্পুৎনিক। দরকার হলে বিজ্ঞানের জন্যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে রাজী।'

এমনি সব চিঠি পাঠাল বৈমানিক, কলেজ ছাত্র, স্কুলের পাইওনিয়ররা। মহাকাশ জয়ের বাসনায় তোলপাড় হয়ে উঠল হাজার হাজার মানুষ।

আর এই সময় মস্কোর একটা শান্ত রাস্তার ধারের বাড়িতে তালিম দেওয়া হচ্ছিল গোটা দশেক পরীক্ষাধীনকে — যাদের মধ্যে থেকে একজন যাত্রা করবে নতুন স্পুৎনিকে। দশটি সুবোধ সুশীল কুকুর ক্ষুদে ক্ষুদে প্যারাশুটিস্টের মতো দেখতে পোষাক পরে ঘুরছিল দোলনায়, আওয়াজে অভ্যস্ত হচ্ছিল, ঘুপচি খাঁচার মধ্যে বসে যত রকমের কষ্ট সইছিল আর আনন্দ করছিল, মানে ঠিক সেই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল যা পরে খেঁকুরে ও আমাদের অন্যান্য বীরেদের ভাগ্যে জোটে।

এই দশটির মধ্যে থেকে বাছাই করা হয় কেবল একটিকে — সেই লাইকা। লাইকা মানে যে বেশি ঘেউ ঘেউ করে।

এ নামটা তার কেন জুটেছিল কেউ জানে না। কাউকে কখনো ডেকে তেড়ে যায়নি লাইকা। আর ঘেউ ঘেউ করেছিল শুধু একবার — অন্ধকার সরু একটা সিঁড়িতে। লাইকা উঠছিল ওপরে আর একটা মেয়ে ছুটে নামছিল নিচে। রাস্তা ছেড়ে লাইকা সরে গিয়েছিল একপাশে, কিন্তু মেয়েটা তাকে দেখতে না পেয়ে তার পা মাড়িয়ে দেয়। লাইকা অল্প একটু কেঁউ করে ভয় পাইয়ে দেয় মেয়েটাকে। ভীতু মেয়েটা কিন্তু গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠে উল্টো ভয় পাইয়ে দেয় লাইকাকে। জীবনে সেই প্রথম গলা ছেড়ে ডেকে উঠেছিল লাইকা।

সরু পা আর অবাক সরল মুখওয়ালা এই অল্পবয়সী দো আঁশলাটার সহ্যগুণ দেখা গেল সবচেয়ে বেশি। যন্ত্র চালু করে ডাক্তার দ্রোনভ ভুরু কুঁচকে মাথা নেড়েছিল। খুব জোর দিয়েছিল সে, সন্দেহ ছিল ধাক্কাটা ও সইতে পারবে কিনা। মহাজাগতিক চিকিৎসা পুস্তক থেকে

কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। এমন পরীক্ষা তখনো পর্যন্ত কেউ করেনি — স্পুৎনিকে যাবার জন্যে যাত্রী তৈরির আয়োজন তার আগে তো হয়নি।

লাইকা কিন্তু সহ্য করে গেল সব, যন্ত্রের শেষ আবর্তন পর্যন্ত। দরজা খুলে সযত্নে লাইকাকে কোলে টেনে নিল দ্রোনভ, পকেট রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে ওর। ঝুলে পড়া কান খাড়া হয়ে উঠল লাইকার। না, ছুঁচলো কানওয়ালা কুকুরটাকে জব্দ করার মতো জোর কোনো শক্তির নেই।

দ্রোনভ সিদ্ধান্ত টানল, 'তাহলে স্টার্টের সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়তে হবে। অতিভারের আক্রমণটা যাতে হয় পিঠ থেকে বুকের দিকে। তারপর স্পুৎনিক যখন কক্ষে গিয়ে পৌঁছবে, তখন একেবারেই সব ভারহীন। মেঝের ওপর একটু পা ঠুকলেই উঠে বসবে কি দাঁড়িয়ে যাবে।'

'শোয়া বসা দাঁড়ানো,' ইওলকিন পুনরাবৃত্তি করলে, 'এ সবই কিন্তু ছোট্ট একটা কেবিনে। স্পেশ্যাল পোষাক চাই, যাতে ধরে রাখাও যাবে, নড়াচড়া করাও সম্ভব হবে, বাচ্চাদের ফতুয়ার মতো।'

'খাওয়াবার ব্যবস্থাটা কিন্তু ভুলবেন না,' ইনস্টিটিউটের মেকানিক সিরিওজা মনে করিয়ে দিল, 'সবই যদি ভারহীন, তবে খাওয়াবেন কী করে? ডিশে জলই ঢালা যাবে না, গোল হয়ে গড়িয়ে যাবে। সসেজ রাখতে গেলে ভেসে যাবে। তা ধরবে কেমন করে, বেল্ট বাঁধা, জায়গা ছেড়ে যাওয়া চলবে না।'

সবাই এক একজন উদ্ভাবক হয়ে উঠল ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। ছেংটে কেটে সেলাই করে তৈরি হচ্ছে বিশেষ পোষাক। হিসেব চলছে দিনে কতখানি খাওয়া দরকার চারপেয়েদের, কতখানি করে শক্তি খরচা হবে তাদের। নানা অনুপানে তৈরি হতে লাগল খাবার, কুকুরদের খাইয়ে দেখা হল। মেনুটা স্থির হল এই রকম: শুকনো রুটি, মাংসের গুঁড়ো, গরুর চর্বি, জল। কিন্তু এসব একত্রে ধরে রাখা যায় কী করে, কী করলে মহাজাগতিক প্রাতরাশ কেবিনময় উড়ে বেড়াবে না।

কার যেন মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল: প্যাস্টিলা! প্যাস্টিলায় খাবার জমালে আটা আটা হয়ে থাকবে। তাকে বলে আগার-আগার। জিনিসটা পাওয়া যায় লালচে সামুদ্রিক উদ্ভিদে।

আগার-আগার পাউডার চমৎকার আবিষ্কার। এতে খাবার, জল, সব চ্যাটচেটে হয়ে তৈরি হবে পুষ্টিকর জেলি। চ্যাটচেটে জিনিসটা ডিশে রাখলে উপচে পড়বে না। খাওয়াও চলবে: মুখরোচক, পুষ্টিকর।

কারখানায় লাইকার জন্যে তৈরি হল একটা সিলিণ্ডারের মতো কেবিন, তাতে গোল গোল একটা জানলা। তার মধ্যে বসল সব যন্ত্র: লাইকার ওপর নজর রাখবে তা, মুখরোচক ওই জেলি সমেত স্বয়ংক্রিয় খাদ্য মেসিন, রাসায়নিক সব পদার্থ — যা কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে অক্সিজেন দিতে থাকবে, আর রইল যাত্রীটির জন্যে বিশেষ একটি কেদারা। হালকা পোষাক পরা লাইকা এই কেদারায় আগুপিছু নড়াচড়া করতে পারবে, শোয়া বসা দাঁড়ানো চলবে। জিনিসটা দাঁড়াল একটা নিরেট
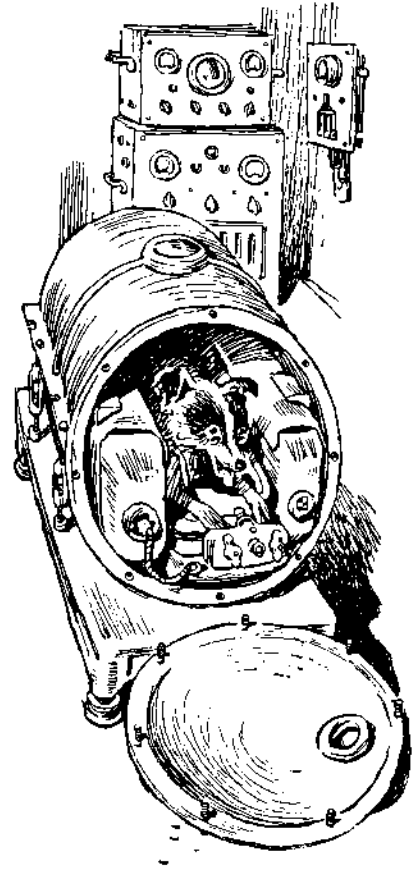
করে বন্ধ করা ছোটো ঘরের মতো, গোল ছাতওয়ালা একটা যেন টব। এর মধ্যে বসে মহাজগতের শূন্যতায় ভয় থাকবে না লাইকার।

এই কেবিনের মধ্যে লাইকা কাটাল দিনের পর দিন। তাকে খাইয়েছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, রাসায়নিক পদার্থ তাকে অক্সিজেন জুগিয়েছে, তার ধাতুর দেয়ালে সৃষ্টি হয়েছে পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ। ব্যস। জানলা দিয়ে ডাক্তাররা অবিশ্যি ভেতরের ব্যাপার লক্ষ্য করেছে তা ঠিক, কিন্তু লাইকা তা টের পায়নি। একলা থাকতে অভ্যেস হয়ে গেল তার, অস্বস্তি বোধ করত না। কেবল খাবার আগে সে শূন্য পাত্রটার দিকে চেয়ে জিভ দিয়ে চাটত।

পৃথিবীতে তো সবই ভালোই চলল, কিন্তু মহাজগতে?

ডাক্তারদের সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ছিল ভারহীনতা নিয়ে। অদৃশ্য চাপের ধকল সইবার পরে একেবারেই হঠাৎ ভার চলে যাবে মহাকাশযাত্রীর, শূন্যে ভাসতে থাকবে। হার্ট তখন কাজ করবে কী করে? এমন বিদঘুটে পরিবর্তন সইবে কী করে?

বিদেশী কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক খুব নিরাশ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: ভারহীন অবস্থায় প্রাণ টিকে থাকবে কেবল মিনিট কয়েক। ওঁরা বলতেন, রক্তের ভার থাকবে না, শিরার গায়ে চাপ পড়বে না, ফলে হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে।

"তাই কী?" সারা দুনিয়ায় মহাজগতের ডাক্তাররা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ল্যাবরেটরির মধ্যে ভারহীনতার অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না, এই হল সবচেয়ে খারাপ। পৃথিবীর মধ্যে শুধু একটি জায়গা আছে যেখানে দেহের ভার নেই — এটি হল ভূগোলকের মধ্যস্থ কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে মাধ্যাকর্ষণের টান চলে সমান জোরে চারিদিক থেকেই, তাই কাটাকুটি হয়ে যায়। কিন্তু অত নিচেই নামতে হবে নাকি? ছ হাজার কিলোমিটার টানেল খোঁড়াই কি আর সম্ভব?

এরোপ্লেন সবেগে উঠল আকাশে। বেগে অনেক উঁচুতে উঠেই ঝুপ করে নামতে থাকল নিচে মস্ত একটা বাঁকা রেখায়, উঁচু থেকে ঢিল ফেলে দিলে যেভাবে নামে। একে বলে প্যারাবোলার রেখায় ওড়া। আর এই প্যারাবোলার ঠিক মাথাটায়, বিমান যখন খাড়া উঠেই ফের নিচে নামছে তখন কেবিনের মধ্যে অল্পক্ষণের জন্যে সৃষ্টি হয় একটা ভারহীন অবস্থা। যুগপৎ দুটি শক্তি কাজ করে তখন, কেন্দ্রাতিগ শক্তি টানে ওপর দিকে, আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানে নিচের দিকে। এই দুই টান যখন সমান সমান হয় তখন ভারহীন হয়ে পড়ে মানুষ। কয়েক সেকেন্ড সে অনায়াসে শূন্যে বসে থাকতে পারে।

বৈমানিকেরা এই নিয়ে গল্প করেছেন হরেক রকম। কারো কারো তখন বমি লেগেছে, মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, সমুদ্রপীড়ায় যেমন হয়। কেউ কেউ নিজের হাত পা নাড়া চাড়াও করতে পারেনি। কারো আবার মনে হয়েছে জিনিসটা দোলনায় শুয়ে থাকার মতো; ভারি উপাদেয় লেগেছে তাদের। বলেছে, আরাম করার সেরা স্যানাটোরিয়ম হল ভারহীনতা।

কিন্তু হয়ত বা ভুল হয়েছে তাদের। বিপদটা হয়ত স্রেফ টের পায়নি তারা।

রকেট ছোড়া হল। তার প্রথম যাত্রী হল কাছিম, ইঁদুর, কুকুর — প্যারাবোলায় ওড়া বৈমানিকদের মতো অল্প সময়ের জন্যে তারাও হয়ে গেল ভারহীন। এখন আর শুধু কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নয়, কয়েক মিনিটের মতো। তবু অক্ষত দেহেই প্যারাশুটে করে ফিরে এল এরা।

তিন, পাঁচ, দশ মিনিট ধরে তারা ছিল ভারহীন অবস্থায়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা, কয়েক দিন যদি থাকতে হয়?

সন্দেহ নেই যে দ্রোনভ, প্রফেসর, ইওলকিন — লাইকাকে যারা ওড়বার জন্যে তৈরি করছিল তারা সবাই ভরসা রেখেছিল যে মহাকাশযাত্রীর হার্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন স্পন্দিত হয়েই যাবে। কিন্তু তাহলেও তাদের আশংকা ছিল অনেক। পায়ের ওপর ভর দিতে না পেরে কী করবে লাইকা। সার্কাসে দোলনায় দোলার সময় অমন যে পশুরাজ সিংহ, সেও তো ভয়ে কাঠ হয়ে যায়; দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে দিব্যি উড়তে পারে সে, কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। সিংহের তখন এমনই ভয় যে নড়ন চড়ন রহিত। এমন ঘটনাও জানা আছে: প্লেনে করে একটা বাঘকে নিয়ে আসা হচ্ছিল চিড়িয়াখানায় — নার্ভের এমনি ঝাঁকুনি খায় যে লোম ঝরে পড়ে তার।

লাইকাও অমন ধারা বেদম ভয় পাবে না তো? নড়াচড়া করবে, খাবে? এ সবই তখন ডাক্তারদের কাছে ধাঁধা মাত্র।
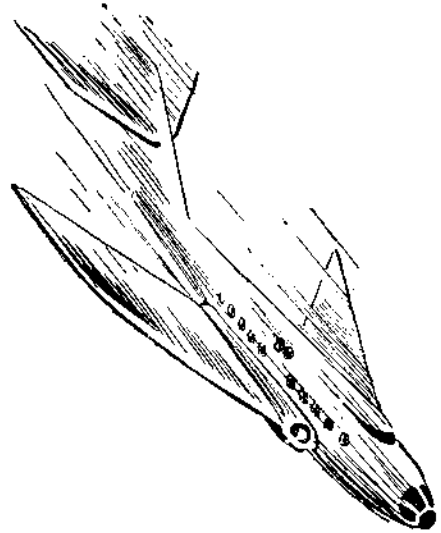
বহুধাপী রকেট — পুরো একটা রকেট ট্রেন ছাড়ল দ্বিতীয় স্পুৎনিক নিয়ে, তার মধ্যে লাইকা।

ওই ১৯৫৭ সালেরই ৩রা নভেম্বর সাহসী এ কুকুরের কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়। সারা দুনিয়ার ভালোবাসা পেল সে। খবরের কাগজে কাগজে লাইকার ছবি। সে ছবি তারা দেখল যেমন আনন্দে তেমনি সখেদে। আনন্দ কারণ, এ হল প্রথম মহাকাশযাত্রীর ছবি; খেদ কারণ জানা ছিল এ মহাকাশযাত্রী ফিরবে না।

লাইকা, লক্ষ্মী সোনা লাইকা! সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের কী আনন্দই না দিয়ে গেছে সে। হাজার কিলোমিটার উঁচুতে উড়তে উড়তে তার বুক যে মৃদু টিক টিক শব্দ করে গিয়েছিল তাতে চাপা পড়ে গেল পৃথিবীর অন্য সমস্ত কোলাহল।

কাগজের ফিতেয় স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডারে আঁকা হয়ে গেল তার নাড়ি চলাচলের ছবি — উঁচু উঁচু মিনারওয়ালা একটা নগরের সিল্যুয়েট রেখার মতো।

বাজল, বাজল, বেজে চলল মহাকাশযাত্রীর হার্ট!

উৎসব শুরু হয়ে গেল ইনস্টিটিউটে। পৃথিবীর ওপর দিয়ে উড়ছে এক প্রথম জীবন্ত প্রাণী, প্রাচীন দুই গ্রীক শব্দে যার পরিচয়: কসমস — মহাব্যোম, নাউটিকা — নাবন; দুয়ে মিলে কসমোনউট, ব্যোমনাবিক। সে গেছে এই দেয়াল ঘেরা বাড়িটা থেকেই।
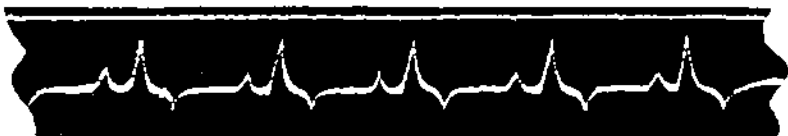
কাগজের ওই ফিতে থেকে ডাক্তাররা টের পেলে, রকেট ইঞ্জিন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর আওয়াজে ভয় পেয়েছিল লাইকা। (আর শুধু লাইকা কেন, রকেটড্রোমে ইঞ্জিনের শব্দে অভিজ্ঞ বৈমানিকদেরও মাঝে মাঝে ধাত উড়ে যায়।) কিছুক্ষণ লাইকা মাথা এপাশ ওপাশ করে, তারপর প্রচণ্ড চাপে সে মেঝের সঙ্গে নেতিয়ে শুয়ে থাকে, হার্টের স্পন্দন হয়ে ওঠে তিনগুণ বেশি দ্রুত — রকেট ট্রেন বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ সব শান্ত হয়ে গেল, লাইকা গিয়ে পৌঁছল নিশ্চল শূন্য দেশে।

ভাগ্যিস দ্রোনভ দেহে লোহার চাপ সহ্য করার শিক্ষা দিয়েছিল লাইকাকে। সেণ্ট্রিফিউগে ঘোরার পরে যেমন হত তেমনি ভাবেই বুক আবার ঠিক হয়ে গেল লাইকার, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল হার্ট। লঘুতার অমন অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে সে পৃথিবীতে আগে কখনো না

পড়লেও ভয় পেল না লাইকা, নিঃশ্বাস টেনে সে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। তারপর খাবার একটু টোকাতেই দেহটা ভেসে উঠল মেঝে থেকে, ভারহীনতায় প্রথম পদক্ষেপ করল মহাকাশযাত্রী।

বিতর্কের প্রশ্নটার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল ডাক্তারদের কাছে: ভারহীনতা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক নয়! ওপর নেই, নিচু নেই, পা রেখে দাঁড়াবার মতো কিছু নেই, মানুষের পক্ষে এতে অভ্যস্ত হওয়া লাইকার চেয়ে বেশি কঠিন তা ঠিক। একটা খাড়াই চুড়োর ওপর দাঁড়ালেও পড়ে যেতে পারি এই ভাবনাতেই মাথা ঘুরে ওঠে তো অনেকের। তবু মানুষ তার বোধ অনুভূতি অভ্যাসের প্রভু। নিজের দেহের ওপর ব্যালে নর্তকদের দখল আশ্চর্য, স্কি জাম্পার তার স্কিয়ে করে লাফ দেয় নির্ভয়ে, জলের তলে বন্দুক হাতে মাছ তাড়া করে বেড়ায় শিকারী ডুবুরি, আকাশ দেখে ভয় পায় না বৈমানিক। শূন্যে ভাসমান থাকার অভ্যেসও রপ্ত করা কঠিন নয়। ভারহীন অবস্থায় হঠাৎ অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে উঠবে হাত পা, সে হাত-পায়ের ওপর দখল রাখার অভ্যেস করে নিতে পারবে মানুষ, প্ল্যাস্টিকের নরম বোতল টিপে টিপে জল খাওয়া রপ্ত করতে পারবে, সিলিঙে বসা মাছির মতো হালকা হয়ে যেতে পারবে, মাথা নিচু অবস্থায় চুম্বকের জুতো পরে হাটতে পারবে।

উড়ে যাওয়া সম্ভব চাঁদে, হার্টের রুগীদের জন্যে বানানো যায় মহাজাগতিক স্যানাটোরিয়ম, কিম্বা নিতান্তই ভেসে থাকা যায় শূন্যে। এ সবেরই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল লাইকার কীর্তিতে।

স্পুৎনিকে সে বেঁচে ছিল সাত দিন। আট দিনের দিন অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়েছিল ...

আর ইনস্টিটিউটে রয়ে গেল একটি শূন্য খাঁচা। তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা ফলক 'এখানে থাকত লাইকা'। সে খাঁচায় আর কাউকে ঢোকানো হয়নি।

ফাঁকা খাঁচাটা যেন এইটে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে পরের মহাকাশযাত্রীকে ফিরিয়ে আনতে হবে মাটিতে।

পয়মন্তর পেনসিল

শীতকাল, তাই বরকাদের বাড়ির রাস্তাটার দুপাশে ঢিপ হয়ে জমল বরফ। সকালে ঘুম ভেঙেই ও শুনত, ফুটপাথের ওপর জমাদারের বরফটানা কোদালের শব্দ।

বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে পোড়ো জমিটা এখন পরিণত হয়েছে স্কেট খেলার ময়দানে, আর যেখানে একদিন দুই সাহসীবীর রকেট ছেড়েছিল ঠিক সেই মাঝখানটায় ম্যানেজার বসিয়ে দিয়েছে ফার গাছ। বরকা একদিন স্বচক্ষে দেখল সে ফার গাছের চারপাশে হাত ধরাধরি করে ল্যুবকা আর গেনা স্কেট করছে। গেনা পেখমের মতো এক পা তুলে আর এক পায়ে '৪'এর মতো রেখায় ভেসে যাচ্ছিল বরফের ওপরে। ল্যুবকাও একটা লাল সোয়েটার আর লাল টুপি মাথায় একই রেখায় স্কেট করছিল। তারপর ওরা থেমে কী সব কথাবার্তা বললে। ল্যুবকার টুপিতে সোনার মতো ঝক ঝক করছিল বরফ। গেনার দিকে চেয়ে ল্যুবকা এমনভাবে হাসল যেন ল্যুবকা নয়, পরী।

সবাই ভারি হাসিখুশি, এমন কি গৃহম্যানেজার পর্যন্ত। বিস্ফোরণের কাহিনীটা সে একেবারে ভুলে গেছে। কিন্তু এই অশুভ ঘটনাটার একটা নীরব সাক্ষী রয়ে গিয়েছিল বাড়িতে, সেটা বকুনির চেয়েও বেশি অস্থির করে তুলেছিল বরকাকে। সোফার পাশে কোণের দিকে চোখে পড়ত ফুটকিদার সেই ছোট্ট তোশকটা যেটাতে শুয়ে থাকত তিয়াপা, চোখে পড়ত রান্নাঘরের গামলাটা, যাতে গিন্নি তার জন্যে সযত্নে জমিয়ে রাখত হাড়। সবচেয়ে অসহ্য লাগত যখন কথা উঠত, আহা, হারিয়ে যাওয়া কুকুরটা কী আদুরে বুদ্ধিমানই না ছিল। বরকা তখন আর সইতে পারত না, টুপিটা টেনে নিয়ে একটা কথাও না বলে ছুটে বেরিয়ে যেত ঘর ছেড়ে। তিয়াপাকে উদ্ধার করার শত শত পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে সে ঘুরত রাস্তায় রাস্তায়। সাধারণত এমন তন্ময় হয়ে থাকত সে যে খেয়ালই হত না কখন আঁধার হয়ে এসেছে, দশতলা প্রকাণ্ড বাড়িটার জানলায় জানলায় রীতিমতো আলো ফুটে উঠলেই তবে বাড়ি ফিরত সে।

আলোকিত জানলাগুলোর দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলত সে, "বাড়ি বটে, হয়ত হাজার দুয়েক লোক থাকে ওতে, হয়ত আরো বেশি। অথচ তিয়াপা হয়ত কোথায় ঠাণ্ডায় জমে মরছে তা নিয়ে কারো এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। গেনা? তার কথা না ভাবাই ভালো। নিশ্চয় বসে বসে রকেট আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। নয়ত বাপের সঙ্গে বসে পত্রিকা দেখছে। কারাতভদের

বাড়িতে পিয়ন কত সব পত্রিকা নিয়ে আসে, নামই মনে রাখা কঠিন।”

কিছু দিন আগেও গেনাকে হিংসে করত বরকা — ওর বাপ সাংবাদিক, আর তার বাপ মামুলী একজন লেদমিস্ত্রি। কিন্তু তাদের ৬ নং ‘ক’ ক্লাস একবার গিয়েছিল ‘বলে’ (বাপের বন্ধুরা তাদের বলবেয়ারিং কারখানাটাকে ওই বলে ডাকত), বরকা সেখানে দেখেছিল গোটা কারখানাঘর জুড়ে প্ল্যাকার্ড লেখা: ‘স্মেলভের পাল্লা ধরো!’ তা দেখে ওর চোখ যেন খুলে গিয়েছিল।

সন্ধ্যায় বাপ যখন ফুল তোলা মস্ত মগটা থেকে বরাবরের মতো চা খাচ্ছিলেন তখন বরকা সামনে বসে তাঁর নাক ভুরু চোখের দিকে এমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যে বাপের ভয় হল।

বিব্রতভাবে বললেন, ‘কী ব্যাপার, অমন তাকিয়ে দেখছিস কী? কী পেয়েছিস আমাকে — বেলভেদিয়েরের অ্যাপলো নাকি আমি? যা তো, শুতে যা।’

শুতে গেল বরকা, কিন্তু এই ভেবে তার বুকের ভেতরটা ফুলে উঠেছিল যে এমন একটা লোকের সঙ্গে সে একই ঘরে বাস করে যার পাল্লা ধরতে চায় সবাই…

“নাকি বাড়ি ফিরে যাব, দাবা খেলা যাবে বাবার সঙ্গে?” নিজের ঘরের জানলাটার দিকে তাকিয়ে বরকা এ ভাবনা বাতিল করে দিলে, “না, আর একটু ঘুরে বেড়ানো যাক। সবুজ আলোটা যখন জ্বলছে তখন বোঝাই যাচ্ছে বাবা তার ড্র্যাফটিং নিয়ে বসেছে…”

লোকে যখন একলা, মন খারাপ, তখন অনবরত ভাবনা খেলে যায় মাথায়। মনে হয় যেন ঘরবাড়ি, রেলিং, রাস্তার বাতিগুলো মন দিয়ে তার কথা শুনছে। শ্রোতা হিসেবে তারা খুব চমৎকার — কখনো কথায় বাধা দেয় না। আর কান থাকলে তাদের কাছ থেকেও কম জিনিস শোনা যায় না।
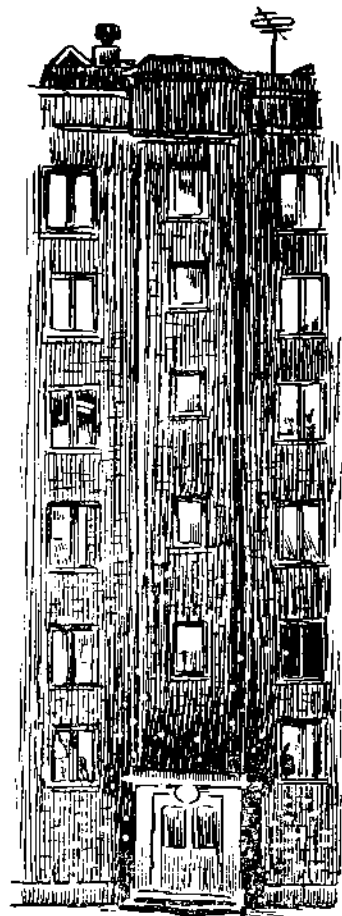
জানলার আলোগুলো থেকে আনন্দিত নিরানন্দ অনেক কাহিনীই টের পায় বরকা। দোতলায় লাল শেড দেওয়া আলো দেখে বলে দেওয়া যেতে পারে ট্রেনার সোফিয়া লেপ কাজ থেকে ফিরেছে নাকি বুড়ি ধাই আনফিসা এখনো সংসারের কাজে ব্যস্ত। কর্ত্রী বাড়ি না থাকলে মিতব্যয়ী আনফিসা জোরালো আলো জ্বালায় না। আর সোফিয়া লেপ ভালোবাসে চোখ ধাঁধানো ঝকঝকে আলো। সোফিয়া লেপের বাড়িতে আছে ট্রেইনড্ সব কুকুর। লোকে বলে তাদের একটা কুকুর নাকি 'ছিঃ' আর 'ননসেন্স' বলতে পারে। ওর কাছে তিয়াপার কথা বললে হয়। কিন্তু তার আশ্চর্য আশ্চর্য সব কুকুরের কোনো একটা নিয়ে সোফিয়া লেপকে যতবার গেটে দেখেছে বরকা, ততবারই তার এ সংকল্প উবে গেছে, আর মিনিট খানেকের পরে মোড়ের পাশে উধাও হয়ে গেছে স্বয়ং সোফিয়া লেপ।

তিন তলার ঝুল বারান্দাওয়ালা ফ্ল্যাটদুটোয় থাকে এক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আর এক নামজাদা শিল্পী। যদি জেনারেলের ঘরে আলো জ্বলে আর শিল্পীর ঘরের জানলাটা অন্ধকার, তাহলে বুঝতে হবে শিল্পী গেছে জেনারেলের বাড়িতে, আর যেই জেনারেলের ঘরের ল্যাম্প নেভে, অমনি শিল্পীর ফ্ল্যাটে জ্বলে ওঠে কমলা রঙের আলো।

শিল্পী কনস্তান্তিন পাভলভিচ রোগভ এক অদ্ভুত ধরনের লোক। রঙ আর পেন্সিল দিয়ে সে দুনিয়ায় ছেড়ে দিত শত শত মজাদার লোককে, বাচ্চাদের খুশি করত। গল্পে আছে, কার্লো বুড়ো নাকি কাঠ থেকে এক লম্বা নাক পুতুল বানাতে গিয়ে বানিয়ে তোলে এক জীবন্ত বুরাতিনোকে। এ ব্যাপারে রোগভ তাকেও ছাড়িয়ে যায়। কার্লো

বুড়োর মতো রোগভও তার সৃষ্ট জীবদের প্রতি ভারি সদয়, তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে বিদঘুটেগুলোকে পর্যন্ত দেখেও ভালো লাগে বাচ্চাদের।

আবহাওয়া যেমনই হোক, দেখা যাবে গরম জুতো, ওভারকোট পরে মাফ্লার জড়িয়ে রোগভ এসে দাঁড়িয়েছে ঝুল বারান্দায়, হাতে একটি ফিল্ড বাইনোকুলার। অদ্ভুত এ মূর্তি দেখে কেউ কেউ তাকে কাগতাড়ুয়ার সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাড়ির ছেলেপিলেরা কেউ শিল্পীকে নিয়ে ঠাট্টা সহ্য করার পাত্র ছিল না।

আসলে শিল্পীর খুব একটা কঠিন অসুখ আছে। ঘর থেকে তার বেরুনো মানা করে দিয়েছে ডাক্তাররা। অথচ ক্যাপটেনের ডেকের মতো ঝুল বারান্দাটা থেকে কিন্তু চারিপাশের অনেকখানিই চোখে পড়ত শিল্পীর। ফিল্ড বাইনোকুলার তাকে পেঁছে দিত রাস্তাঘাটে, আর বুড়ো জোয়ান, চিন্তিত ফুর্তিবাজ অনন্য কত মুখ ভেসে উঠত তার দৃষ্টিপথে। শিল্পীর ফ্যাকাশে মুখ থেকে গালভরা হাসি কখনো মিলাত না। সারা মুখ যেন আলো হয়ে উঠত তাতে, সদানন্দ রগুড়ে চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত আরো।

ভিড়ের মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু একটা হয়ত সে দেখল। অমনি একটা হাত চোখের কাছে বাইনোকুলার তুলে ধরত আর একটা হাত চেপে ধরত পেনসিল।

কয়েক মিনিট পরেই দেখা যেত শাদা কাগজের ওপর বড়ো কর্তার মুখের দিকে কুকুরের মতো চেয়ে তোষামোদ করছে কর্তাভজা; বস্তাকৃতি এক চওড়া ওভারকোট পরা অতি ফ্যাশনেবল মেয়ে চলেছে তড়বড় করে; ভারি পোর্টফোলিওর চাপে নুয়ে পড়েছে ব্যুরোক্রাট।

রোগভের ছবি দেখে অনেকে প্রথমে হো হো করে হেসে উঠেছে, তারপর চুপ করে গেছে হঠাৎ, নিজেকে চিনতে পেরে চোখ সরিয়ে নিয়েছে লজ্জায়।

বরকার মনে পড়ল আজ সকালে রোগভের ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে যাবার সময় ধাক্কা লেগেছিল একটা লম্বা লোকের সঙ্গে, হাসতে হাসতে লোকটার দম বন্ধ হবার জোগাড়। বোঝা যায় ঘর থেকেই হাসি শুরু হয়েছিল। তখনো কিছুতেই থামাতে পারছিল না। অপরিচিত লোকটা মাথা নেড়ে উবু হয়ে চোখের জল মুছলে; তারপর দম নিয়ে ফাইলটা খুলে তাকিয়ে দেখলে ছবিটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ফের এক হাসির দমক।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বরকাও পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছিল ছবিটার দিকে, সেও এমন হো হো করে হেসে উঠেছিল যেন পেটের মধ্যে শুড়শুড়ি দিয়েছে কে। কাকাতুয়ার আদলে একটি ফুলবাবুর ছবি সেখানে।

রোগভের এই পরিচিতটি বরকার দিকে চোখ টিপে হাত তুলে ট্যাক্সি থামাল। সম্পাদকীয় দপ্তরে ছুটছিল সে। তার ক্ষিপ্রতার ওপরেই নির্ভর করছিল ছবিটা কাল সকালের কাগজে প্রকাশিত হবে কি হবে না। ঠিক সময়ে যদি পেঁছতে পারে তাহলে কাল হাজার হাজার,

না লাখ লাখ লোক হাসবে নির্বোধ বাবুগিরির নিদর্শন দেখে। আর সবাই জানে, হাসির ক্রিয়াটা ওষুধের মতো মোক্ষম।

"কিন্তু রোগভ যদি তিয়াপার ছবি এঁকে দেয়, তাহলে এই লোকগুলো হয়ত তাকে সন্ধান করে বের করায় সাহায্য করতে পারে!"

এই আকস্মিক ভাবনাটায় বুক ধক করে উঠল বরকার। বাড়ির জানলার আলোর দিকে তাকাল সে। রোগভের স্টুডিয়োতে আলো জ্বলছে। এক্ষুনি, এক্ষুনি যেতে হবে ওর কাছে!

'শুভ সন্ধ্যা, তরুণ বন্ধু, বলো কী করতে পারি।'

হাসিখুশি, বলি রেখাঙ্কিত দুচোখে ভরসা দেবার মতো করে তাকিয়ে রইল শিল্পী আর চৌকাটে দাঁড়িয়েই তড়বড় করে বরকা তাকে শোনাতে শুরু করল তিয়াপার কথা, রকেটের কথা। বাধা না দিয়ে শিল্পী ঘরে পিছিয়ে এল, অতিথিকে নিয়ে এল তার স্টুডিয়োয়, একটা ছোটো নরম সোফায় বসাল তাকে, একেবারে জীবন্তের মতো একটা লালচে মখমলের বেড়ালের কাছে। নিজে বসল রঙ পেনসিল কাগজ ছড়ানো টেবিলের সামনে।

'সত্যি, দুঃখের কাহিনী,' দরদ দিয়ে বললে রোগভ, 'কিন্তু লোকে যে বেশি চট করে সাড়া দেয় মজাদার হাসির ব্যাপারে। তবে দেখা যাক, দেখাই যাক। এখুনি শুরু করছি।'

রোগভ পেনসিল তুলে নিল। আঁকতে শুরু করল বেশ মন দিয়ে, যেন আক্রমণ করলে শাদা কাগজটাকে। কিছুক্ষণ পরেই অ্যালবাম এগিয়ে দিল সে বরকার দিকে।

'এই রকম চেহারা?'

'এই চেহারা!' অবাক হয়ে সানন্দে বললে বরকা। তার সামনে তিয়াপা, তারই তিয়াপা! একশ কুকুরের মধ্যেও সে তার লম্বাটে মুখ, কালো কালো সোহাগে চোখ দেখে ঠিক চিনে নিতে পারে — সে চোখ যেন জিজ্ঞেস করছে "আমি তোর বন্ধু, আর তুই?"

'আমার প্রধান সমালোচক যখন বললে চেহারা এই রকমই, তখন ছবিটার পেছনে লাগা যেতে পারে,' খুশির স্বরে বললে রোগভ।

'সে কী,' অবাক হল বরকা, 'লাগা যাবে মানে? তিয়াপার ছবি তো এঁকেই দিয়েছেন।'

'নারে খোকা, ছবি এখনো হয়নি। যেটা দেখলি সেটা শুধু স্কেচ। ধৈর্য ধরতে হবে তোকে।'

ফের চুপটি করে সোফায় বসল বরকা, আর এঁকে চলল রোগভ। এবার ও আঁকল ধীরে ধীরে, থেকে থেকে আঁকা থামিয়ে কী দেখে হেসে নিচ্ছে, সেই জানে।

বরকার যখন মনে হতে লাগল শিল্পী বোধ হয় তার কথা একেবারেই ভুলে গেছে তখন হঠাৎ ডাকল তাকে রোগভ।

'তাহলে সমালোচক, এবার দ্যাখ তো চেয়ে।'

সমালোচক এগিয়ে এসে তাকিয়ে দেখল, এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যে মুখে কথা সরল না। বুঝতে পারল না খুশি হবে নাকি রাগ করবে।

ও যতক্ষণ বসে বসে ভাবছিল, ততক্ষণে সাধারণ একটা কুকুর থেকে তিয়াপা পরিণত হয়েছে মহাকাশযাত্রীতে। রকেটে উড়ছে সে, বাতাসের ঝাপটায় উলটে গেছে তার কান পতাকার মতো। এটাও মেনে নেওয়া যেত কিন্তু টেরা চোখ খরগোস, নেকড়ে, কাঠবেরালি, প্যাট-করে-লেজ-আঁচড়ানো শেয়াল লাফাচ্ছে, পা নাড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে — এরা সব এল কোথা থেকে? পরে বরকা নজর করে দেখলে যে এই বাছাই করা সমাবেশটা জুটেছে তিয়াপাকে সম্বর্ধনার জন্যে। ফুলের তোড়া হাতে র‍্যাস্পবেরি ঝোপ থেকে ছুটে এসেছে ভালুক। লেজে লেজে হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছে ভীতু ভীতু ইঁদুরগুলো। বোকা গম্ভীর সারস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ডানা দোলাচ্ছে, খেয়ালই নেই জলা থেকে যে ব্যাঙটিকে সে সঙ্গে এনেছিল সে ততক্ষণে তার ন্যাড়া ঠ্যাঙ ধরে ঝুলতে শুরু করেছে।

ফিক করে হেসেই বরকার মনে হল: কিন্তু ব্যঙ্গ চিত্র কেন? ভুরু কুঁচকে ভারিক্কি ভাব করে সে তাকাল ব্যাঙটার দিকে। দেখলেই হাসি পায়... সংযম হারিয়ে বরকাও হেসে ফেললে।

রোগভ এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল তাকে, এবার হাঁপ ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেলল... বোঝা যাচ্ছে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে।

প্রধান কথা ছবি যেন পাঠকদের চোখ টানতে পারে। ছবিটা তারা দেখতে শুরু করবে, আর তলের লেখাটাও পড়বে নিশ্চয়। সেখানে দেওয়া থাকবে হারিয়ে যাওয়া কুকুরটার ছোট্ট একটা ইতিহাস এবং অনুরোধ, তিয়াপার মতো কোনো কুকুর কোথাও কেউ দেখে থাকলে অবিলম্বে যেন সম্পাদকীয় দপ্তরে খবর দেওয়া হয়।

এক সপ্তাহ কাটল। নতুন ছবিটা ছাপা হল সবচেয়ে মজাদার এক শিশু পত্রিকায়। জরুরী, মামুলী শত শত চিঠি পেঁৗছল সম্পাদকীয় দপ্তরে। সব চিঠি টেবলে জড়ো করা হল। সম্পাদক তা থেকে একটি চিঠি তুলে নিলেন: ক্রাস্নপ্রুদনায়া থেকে এক কুকুরের মালিক বড়ো বড়ো গোল গোল অক্ষরে লিখেছে, "প্রিয় সম্পাদক, শিল্পী খুড়ো আমার টেঁপীর যে ছবি এঁকেছেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার টেঁপী তিন পর্যন্ত গুণতে পারে, আমি পারি দশ পর্যন্ত।"

খুব একটা তাৎপর্যসূচক 'হুঁ' উচ্চারণ করে সম্পাদক [illegible]পরের চিঠিটা ধরলেন। চিঠির সঙ্গে খাম থেকে বেরুল একটা শক্তসমর্থ বুলডগের ফোটো। ছুঁচলো মুখ তিয়াপার সঙ্গে বুলডগের কোনো মিল না থাকলেও পত্রপ্রেরকের স্থির ধারণা হয়েছে যে শিল্পী তার বুলডগটার ছবিই এঁকেছেন।

আরো কিছু চিঠি পড়ার পর সম্পাদক চোখ বুজে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর ধারণা

হল মস্কোয় অন্তত দুশো কুকুর ঘোরাঘুরি করছে যাদের একটার সঙ্গে আর একটার তফাৎ করা মুশকিল, যেমন তফাৎ নেই দুই বিন্দু জলে। এই সব কুকুর তাদের মনিবদের সার্টিফিকেট অনুসারে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে শিশুদের উদ্ধার করেছে, চোর ধরেছে, সহ্যগুণ, সাহস, প্রভুভক্তি তাদের অশেষ — এক কথায় সুদূরতম গ্রহে যাত্রা করার পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু এদের কাউকেই রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায়নি, সবকটিই বাচ্চা থেকে মানুষ করা। সংক্ষেপে, কেউ এরা তিয়াপা নয়।

একথা বরকা জেনেছিল খোদ রোগভের কাছ থেকে। প্রথম বারে যে সোফাটায় সে বসেছিল, সেইখানেই লালচে বেড়ালের পাশে বসেছিল সে।

'এই তো ব্যাপার ভাই। আমাদের ফন্দিটা খাটল না,' খবর জানিয়ে উপসংহার টানল রোগভ, হাসল খানিক অপরাধীর মতো, 'আমার লাইব্রেরিটা দেখবি নাকি?'

'না, আমি চলি,' বরকা বললে বিষণ্ণ সুরে। আর সময়টা ভর দুপুর হলেও বিদায় নেবার সময় বললে, 'শুভ রাত্রি।'

অবাক হল না শিল্পী; মন খারাপ থাকলে কী না বলে লোকে...

ক্লরেলা

ল্যুবকার স্থির বিশ্বাস ছিল যে একবার চৌকাট পেরলেই অমনি শুরু হয়ে যাবে একটা অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার, মোড় নিতেই শোনা যাবে ফুর্তির ঘণ্টা, উন্মোচিত হবে সেই রহস্য যা তাকে খুব একটা সানন্দ বিস্ময়ে আচ্ছন্ন করে দেবে। তাই সিঁড়ির চত্বরে যখন সে দেখল বরকা বেরুচ্ছে শিল্পীর ফ্ল্যাট থেকে, তখন সে মনে মনে ভাবলে: "শুরু হয়েছে..." 'ক. প. রোগভ' দরজার ওপর নেমপ্লেটটার দিকে বিজ্ঞের মতো তাকিয়ে সে তার সন্ধানী দৃষ্টি ফেরালে বরকার দিকে, দুষ্টুর মতো চোখ টিপে বোঝালে যে সে সব জানে। কিন্তু আসলে যেহেতু কিছুই জানত না, তাই বলবার সময় শুধু বললে:

'বরকা, স্কেট করতে যাবি?'

মেয়েটার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বরকা নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

নীরবেই এসে দাঁড়াল ওরা রাস্তায়। দিনটা রবিবার, রোদ্দুরে ভরা, কনকনে ঠান্ডা নয়, মচ মচ শব্দ উঠছে স্কি থেকে, কিচির মিচির করছে চড়ুই। ল্যুবকার ইচ্ছে হয়েছিল বলে, "নে, খুব হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না।" কিন্তু গেন্যাকে দেখে সে থেমে গেল। উদ্ভাবকের মুখখানা এমন ফ্যাকাশে যেন কোনো বড় অসুখ থেকে উঠেছে। ল্যুবকা ভাবলে, "ওরও কষ্ট হচ্ছে বৈকি, বরকার সঙ্গে ওর ভাব করিয়ে দেওয়া দরকার।"

'স্কেট করতে যাবি?'

গেনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল যে ল্যুবকার প্রশ্নটা অসম্ভব একটা বোকার মতো প্রশ্ন।

খুব কাজের লোকের মতো গলায় বললে, 'কেন আমার কি কাজকম্ম কিছু নেই?'

'চাঁদে যাবার তোড়জোর করছিস বুঝি,' হুল ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলে ল্যুবকা।

'দেখিস, বেশি জ্ঞান ফলাতে গিয়ে আবার বুড়িয়ে না যাস,' এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বরকার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে জবাব দিলে গেনা।

অমন ধারা জবাব শুনে বরকা শিষ দিয়ে এগিয়ে গেল।

না, ল্যুবকার কপাল আজ মন্দ। বুঝলে দিনটা হবে নীরস, মামুলী। রহস্যময় একটা কাণ্ড যে তার কয়েক পা দূরেই অপেক্ষা করছে, সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না তার।

গেনা কারাতভ সত্যি সত্যিই ওড়বার আয়োজন করছিল। আগে থেকেই সে নিজেকে ট্রেনও করছিল, নিজের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছিল। বলা তো যায় না, উড়ন্ত রকেটে কত কী কষ্ট সইতে হবে। একদিন দুদিন নয় হয়ত বা গোটা বছর ধরে উড়তে হবে তাকে, কোনো দূর তারায় পেঁছতে হবে। আর এই গোটা সময়টা ধরে খেতে হবে, পান করতে হবে আর নিশ্চয় নিঃশ্বাসও নিতে হবে। গেনা হিসেব করে দেখল, মানুষ দিনে নিঃশ্বাস নেয় চব্বিশ পিপে বাতাস — ঘণ্টায় এক এক পিপে। আর যদি এক বছর উড়তে হয় তাহলে কত পিপে দরকার? একটা রকেটে তা ধরবেই বা কী করে? মহাকাশযাত্রীর বাঁচার একমাত্র উপায় হল ক্লরেলা, অক্সিজেন ছাড়ে তা, খাওয়াও যায় — আর দিনে দিনে নয়, বাড়ে যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

এই জলজ উদ্ভিদটার চাষ গেনা করেছিল তার অ্যাকোয়ারিয়মে। নিজের ওপর ক্লরেলার ক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্যে ও ঠিক করলে তিন দিন কিছুই খাবে না; খাবে শুধু ক্লরেলা — আর কিচ্ছু নয়।

গেনা যখন ল্যুবকার সঙ্গে কথা কইছিল তখন ক্ষিদেয় মাথা ঘুরছিল তার, কিন্তু ও কিছুতেই বুঝতে দেয়নি যে সুস্থ বোধ করছে না। ল্যুবকা বেশ স্থির সংকল্পেই পোড়ো মাঠটার দিকে এগিয়ে গেল, দেখে হিংসে হচ্ছিল তার, কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। মহাকাশযাত্রীকে হতে হবে দৃঢ়চিত্ত হিম্মৎওয়ালা লোক। আফশোস, যে সবাই তা বোঝে না, এমন কি মাও না। অনবরত মা কেবল তার কাটলেট নিয়ে জেদাজেদি করছে: খা রে, নে খেয়ে নে...

নিঃশ্বাস ফেললে গেনা, বরফের দলা ছুড়ে মারলে জানলায় বসা একটা চড়ুইয়ের দিকে, তারপর বাড়ি চলে গেল।

বাড়িতে মা আস্তিন গুটিয়ে রান্নায় লেগেছে। মুখটা লাল। আপেল পিঠের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ফ্ল্যাটে। গেনার মুখের ভেতরটা লালায়িত হয়ে উঠল। যে দিকেই তাকায় সেদিকেই কেবল বড়ো বড়ো গোল গোল লালচে পিঠে, হলদে জ্যাম। মাথা পর্যন্ত ঝাঁকাল গেনা, দৃশ্যটা তাড়াতে চাইল তার চোখ থেকে।

মনের দৃঢ়তা অটুট রাখার জন্যে সে চলে গেল লেখার টেবিলে, খুলে বসল বিখ্যাত বিজ্ঞানী ৎসিওলকভস্কির ডায়েরি।

'"নিজের ওপর পরীক্ষা চালালাম ..."' ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এবং সর্বক্ষণ পিঠের
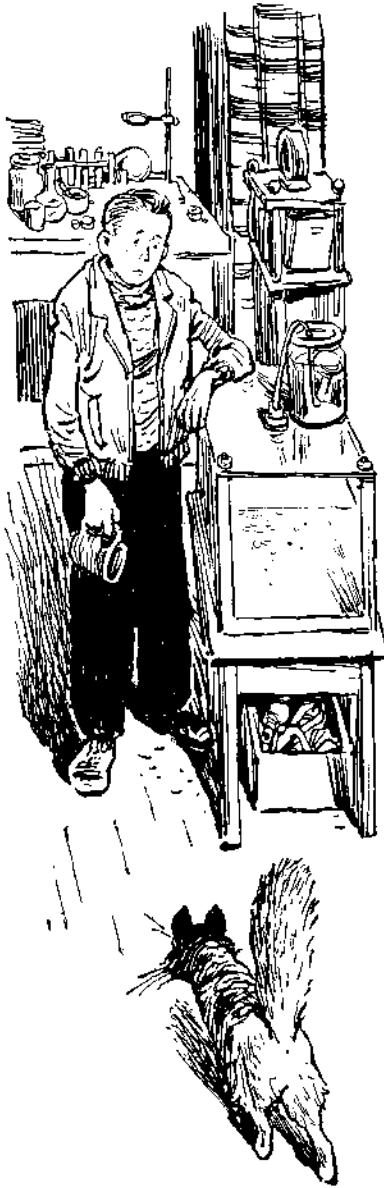
কথা ভাবতে ভাবতেই জোরে জোরে পড়তে লাগল সে, '"...কয়েক দিন কিছুই পানাহার করলাম না।" দ্যাখো তাহলে! কয়েক দিন। আর আমি? একদিন উপোস দিয়েই হার মানতে বসেছি। ৎসিওলকভস্কির পক্ষে অবশ্য সহজ ছিল, কেউ তার পেছনে লাগেনি। আমার মতো বাপমায়ের সঙ্গে যুঝতে হয়নি তাকে। তিশকা না থাকলে তো সমস্ত পরীক্ষাই পণ্ড হয়ে যেত...'

'তিশকা, তিশকা...' ডাক দিল গেনা।

লোমশ একটা সাইবেরীয় বেড়াল আলস্যে উঠে বেরিয়ে এল আলমারির পিছন থেকে। গেনা যবে থেকে ক্লরেলা খেতে শুরু করেছে, তখন থেকেই স্পষ্টতঃ মুটোতে শুরু করেছে ও।

'এবার আমাদের ভোজন হবে কিন্তু,' বেড়ালটাকে হুঁশিয়ার করে দিল গেনা।

অ্যাকোয়ারিয়মের কাছে এসে নীরস দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে দেখল সবজে মতো ঘোলা জলের দিকে। ক্লরেলা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তা হলেও একটা গেলাস নিয়ে ফানেলের মধ্যে ফিলটার পেপার দিয়ে জল ছাঁকতে লাগল। সেই সঙ্গে সে তিশকাকে আশ্বাস দিলে:

'ক্লরেলার ভেতরে তো সবই আছে; প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, কার্বন, ভিটামিন এ, বি, সি। তাই ভাবনার কিছু নেই তিশকা।'

সবেতেই সায় দিল তিশকা। গেনার ঘোষণায় অনুমোদন জানাল ঘড়ঘড় আওয়াজ করে।

বীরের মতো ক্লরেলা গলাধঃকরণ করে গেনা উবু হয়ে বসল। টেবলের তল থেকে টেনে বার করলে কাটলেটের ডিশ।

'এদিকে আয় তিশকা, আয় দেখি,' আদর করে বেড়ালটাকে ডাকল সে।

তিশকা শুকে দেখল কিন্তু খেল না। (এর আগেই গেনার প্রাতরাশ আর ডিনার খেয়ে শেষ করতে হয়েছে তাকে।)

'সে কীরে? আমায় ডোবাবি নাকি?' কঁকিয়ে উঠল গেনা, আর একটু হলেই অভিমানে কেঁদে ফেলত সে। ভয় পেয়ে বেড়াল ঢুকল আলমারির নিচে। কিন্তু পরাজয় মানবে না গেনা। লেজ ধরে টেনে বার করলে বেড়ালটাকে, জোর করে বসালে ডিশের সামনে।

'খা, খা বলছি বেইমান!' হুকুম দিল সে।

গোলমাল শুনে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে উপোসী গেনাকে মা দেখল ওই অবস্থায় — উবু হয়ে বসা, কোলে তার অনিচ্ছুক বেড়াল, সামনের প্লেটে ঠাণ্ডা কাটলেট।

সবই কবুল করতে হল। এক্ষুনি যদি সে না খেতে শুরু করে তাহলে অ্যাকোয়ারিয়ম সমেত সমস্ত কুরেলা জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলা হবে এই হুমকি শুনে পিঠেতেই রাজী হল সে।

আপেল পিঠে কুরেলার চেয়ে শতগুণ মিষ্টি হলেও ভাবী তারকাযাত্রী কিন্তু তা মুখে তুললে বেশ ধীরে ধীরেই আর সারাক্ষণ নিজেকে বোঝালে মহাকাশযাত্রায় পিঠের চেয়ে কুরেলাতেই কত সুবিধা।

কামান নাকি রকেট?

কত অদ্ভুত যোগাযোগই না ঘটে জীবনে। আলোর শেডের নিচে ঘরের মধ্যে বসে আছে নানান ধরনের লোক। হঠাৎ কেমন একঘেঁয়ে লাগতে লাগল একজনের। মিনিট খানেকের মধ্যেই দেখা যাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় লোকটাও জুটেছে আড্ডা দিতে। হাই তোলার মতো একঘেঁয়েমিও যেন এক জনের কাছ থেকে আর এক জনের মধ্যে ছড়ায়। বড়দের একঘেঁয়েমি লাগলে তারা একলা থাকতে চায়। আর যাদের বয়স তেরো, তাদের যদি পড়া সাঙ্গ হয়ে গিয়ে থাকে, শার্লক হোম্‌স সম্বন্ধে বইটা যদি জুল ভার্নের 'রহস্যদ্বীপ' আর ডাক টিকিটের অ্যালবামের সঙ্গে বিস্মৃত হয়ে পড়ে থাকে শেলফে, আর বয়স্কদের কেউ যদি আর 'সামুদ্রিক লড়াই' খেলতে না চায়, আর গতকালের তুষার ঝড়ের পরে যদি স্কেটিং মাঠে বরফ যেন ইচ্ছে করেই এমন উলটুল হয়ে ওঠে যে আত্মসম্মানী কোনো স্পোর্টসম্যানই স্কেট নিয়ে হাজির হতে রাজী নয় — তখন তেরো বছরীরা সব জোটে বাড়ির সদর দরজার কাছে, আলাপ চলে দূর তারা থেকে আসা রহস্যময় সব সঙ্কেত, অদৃশ্য মহাবীর, অমর হবার গুপ্ত কথা, আর সেই সব ভাগ্যমন্তদের নিয়ে যারা হাজার বছর পরেও একই ভাবে সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার

নীলাভ আবছায়ায় তর্কাতর্কি করবে। অশেষ এই আলাপ চলতেই থাকবে যতক্ষণ না ওপর তলার কোনো একটা জানলা খুলে গিয়ে ঝঙ্কার উঠবে "এগারোটা বেজেছে আড্ডাবাজ কোথাকার, ঘরে আয় শিগগির!"

এই ভাবেই সেদিন পথচারীদের অসংখ্য পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা পথের ধারে বিনা যোগসাজশেই দেখা হয়ে গেল আমাদের তিন নায়কের। অপ্রত্যাশিতভাবে এমন পাশাপাশি দেখা হয়ে গেলে বলতেই হয় "কেমন আছিস!" তবে সেই সঙ্গেই প্রত্যেকেই একটু সরে দাঁড়াবার জন্যে পা বাড়ায়। তাহলেও আলাপ করার ইচ্ছেটা কিন্তু দড়ির মতো বেঁধে রাখে তাদের, ওইখানে দাঁড়িয়েই উশখুশ করে, আশা করে কেউ হয়ত সেই যাদুকর কথাটা শেষ পর্যন্ত বলে দেবে, যার পর হালকা হয়ে যাবে বুক, লজ্জা করবে না, চোখাচোখি হলে অস্বস্তি হবে না। সে কথাটা ল্যুবকাই বললে প্রথম।

'এ্যই, ওই দ্যাখ্,' মাথা তুলে সে বললে, 'ধ্রুব তারাটা আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায়!'

তার কথা মেনে মাথা তুললে ছেলেরা।

'এখন আর দেখা যাচ্ছে না, মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে, নইলে তোদের জ্বলজ্বলে তারাগুলো দেখিয়ে দিতাম,' গেনা বললে।

বরকা লক্ষ্য করলে তার ভূতপূর্ব সাথী 'তোকে' না বলে বলল 'তোদের'। বাড়ির মাথার ওপরে বড়ো মতো নিশ্চল তারাটা কেমন ঠাণ্ডা কনকনে, আর গেনা যে নামগুলো বলে যাচ্ছিল সেগুলোও ঠিক তেমনি ঠাণ্ডা: "আল্‌গল্‌, আলদেবারান্‌, আল্‌টেইর্‌, আল্‌ৎসিয়ন্‌, আণ্টারেস্‌, আর্ক্টুর্‌..." কিন্তু বরকার মনে হল বাতাস যেন একটু উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

'ঠাণ্ডা নেই, বরং গরম,' বললে ও খাপছাড়াভাবে।

'আর চাঁদে ঠাণ্ডা পড়ে শূন্যের নিচে ২৭০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড — এই হচ্ছে একেবারে শেষ তথ্য,' জবাব দিলে ভূতপূর্ব সাথী।

ইতিমধ্যে ল্যুবকা তার ফেল্টের হাই বুট পরে চলে গেছে সেই বরফ-ঢাকা চালা ঘরটাতে, যেখানে শরৎকালে আপেল বিক্রি হত। লাফিয়ে উঠে সে বসে পড়ল শূন্য কাউণ্টারটার ওপর।

'এই — সব চলে আয় এখানে। কী মজা! বাতাসের কোনো ঝাপটা নেই!'

বরফের মসৃণ আস্তরের ওপর সর্বশক্তিতে পা ঠুকে ঠুকে ছুটে গেল বরকা আর গেনা। চালাটায় যখন পেণছল তখন ওদের হাই বুট বরফে ভরা। এক পায়ে চালা ধরে দাঁড়িয়ে ওরা বুটের বরফ ঝাড়তে লাগল আর ভয় দেখাল ল্যুবকাকে বরফের স্তূপের মধ্যে ফেলে দেবে। কিন্তু যে কোনো পরীক্ষাতেই ল্যুবকা রাজী, সোল্লাসে ও লক্ষ্য করলে যে বরফ গলছে।

'দাঁড়া, এখুনি আমরা তোর মজা দেখাচ্ছি!' চেণচাল বরকা, বোঝা গেল 'আমরা' বলতে পেরে বেশ তৃপ্তিই সে পাচ্ছে। তারপর সর্বশক্তিতে বরফের গোলা ছুড়ে মারল দেয়ালে। গেনাও তুলতে লাগল বরফ।

'এই নে তোর এক নম্বর স্পুৎনিক,' এক একবার ছুড়ে মারে সে আর মন্তব্য জুড়ে দেয়, 'এই বার দু নম্বর স্পুৎনিক, এবার তিন নম্বর! আর এইটে — এ হল রকেট "স্বপ্ন"।'

দোকান ঘরের মধ্যে জমতে লাগল এক বরফের পাহাড়। ল্যুবকা চ্যাঁচায় আর লুকায়।

'এই! খুব হয়েছে, থাম!' অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে চেঁচিয়ে বললে সে, 'আয় তার চেয়ে বরং প্রশ্নোত্তর খেলি। সবাই ভেবে রাখো, জীবনের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন কী। পরে আলোচনা করব। নাও, ভাবো সবাই — ভাবো ঠিক করে।'

'যত সব,' মুখ ঝামটা দিল বরকা, কিন্তু পরের মুহূর্তেই চুপ করে গেল সে কারণ গেনা হাসছিল না।

দোকান ঘরটায় ঠেস দিয়ে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ল্যাম্পপোস্টের নিচে ঝলক দিয়ে ওঠা ক্ষুদে ক্ষুদে প্যারাশুটগুলোর দিকে। ঘুরছে প্যারাশুটগুলো, গায়ে গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, উড়ে চলে যাচ্ছে একপাকে আর মাটিতে নেমে মিশে যাচ্ছে তার সহোদরদের শাদা একটানা আস্তরে, গড়ে তুলছে পৃথিবী ঢেকে দেওয়া একটি একক প্যারাশুট। হঠাৎ কেমন সব প্রশ্ন নাড়া দিয়ে উঠল তার মাথায় — অবিলম্বে যার উত্তর প্রয়োজন। এ প্রশ্নের সবকটিকেই মনে হল প্রধান, যার সমাধান না করে বাঁচাই চলে না পৃথিবীতে।

'নমস্কার টুনটুনিরা!' হঠাৎ একটা অপরিচিত গলা কাছেই কোথায় গমগম করে উঠল। দোকান ঘরটার পেছন থেকে বেরিয়ে এল বাদামী একটা ফার ওভারকোট আর মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া টুপি পরা একটা লোক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে আগন্তুক হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে দেখল গোটা দলটার দিকে। 'বটে, বটে... তা কী করা হচ্ছে এখানে? গতবছরের আপেল খোঁজা হচ্ছে নাকি? আহা, আহা রাগ করতে হবে না!' বরকার ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখে আপোষের সুরে সে বললে, 'ঠাট্টা করছিলাম! বলতে কি, খুশি হয়েই তোদের সঙ্গে আড্ডা মারতে রাজী। ম্যাজিক দেখাতে পারি। দেখবি, বলব কে কী ভাবছে? সত্যি, লোকের ভেতরটা আমি দেখতে পাই। যেমন এই তুই,' আঙুল দিয়ে সে খোঁচা দিল লুবকার হাতায়, 'তুই পা দোলাতে দোলাতে ভাবছিস, আচ্ছা দুনিয়ায় ঠিক হুবহু আমার মতোই আর একটা লোক আছে কী না, যে ঠিক এই সময়েই দোকানের কাউণ্টারে বসে পা দোলাতে দোলাতে ভাবছে, টিকটিকির লেজ যদি কেটে এমন জায়গায় ফেলে দেওয়া যায় যে কিছুতেই তা আর সে খুঁজে পাবে না, তাহলেও তার লেজ গজাবে কি?'

মুখ হাঁ হয়ে গেল লুবকার।

'আপনি কাকু, যাদুকর?' গুরুত্ব দিয়েই সে জিজ্ঞেস করলে।

'নারে, বোকা, এ সবই বোঝা যাচ্ছে তোর উটকো নাকটা থেকে। আর তুই,' বরকার কাঁধে হাত রেখে আগন্তুক বললে, 'তোর সাধ অদৃশ্য মানুষ হবার... আর তুই,' গেনার কাছেই এল সে, 'আর তুই ভাবিস এমন একটা ওষুধ বার করা যায় না, যাতে গায়ে হবে সিংহের মতো জোর আর হরিণের মতো গতি? এ সব প্রশ্নই একেবারে বাজে প্রশ্ন। তোরা বরং ভেবে ভেবে

বল ত দেখি মানুষ কিভাবে চাঁদে গিয়ে পেঁাছবে, কামান থেকে ছুড়ে দেওয়া হবে, নাকি রকেটে করে যাবে?'

প্রশ্ন করেই অপরিচিত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে জবাবের অপেক্ষা না করেই চলে গেল।

'এই হল আসল জিনিস!' উল্লাসে নিঃশ্বাস ফেলল বরকা, 'ঐ মনের কথা বলে দিতে পারার বিদ্যে যদি শিখতে পারতাম!'

'সব কিন্তু ঠিক ঠাক বলেনি ও — হরিণের কথা আমি ভাবিনি,' গেনা বললে।

'কিন্তু টিকটিকি, টিকটিকির কথা ও বললে কেমন করে?' ল্যুবকার মুখ থেকে বিস্ময় তখনো কাটেনি।

'ইস, এত তাড়াতাড়ি যদি না চলে যেত, তাহলে ওকে আমি জবাব দিতাম, কামান থেকে নাকি রকেটে চেপে!' উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বললে বরকা।

'কী বলতিস তুই?' জিজ্ঞেস করলে বন্ধু।

'বলতাম, কামান ক্লাবের সভাপতি বারবিকেনের সেই ক্ষেপণকের উদ্দেশে বিখ্যাত স্তবসঙ্গীতটা মনে আছে ত?' বলে বরকা পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগল: 'হে আশ্চর্য গোলক, হে অপূর্ব ক্ষেপণক! স্বপ্ন দেখি একদিন ঐ ঊর্ধ্বে তোমায় বরণ করে নেওয়া হবে পৃথিবীর দূতের মর্যাদায়!'

'এ আবার কী কবিতা? বারবিকেন আবার কে?' কৌতূহলী হয়ে উঠল ল্যুবকা। এমন কি কাউন্টার থেকেও নেমে এল সে।

'খেঁদী কোথাকার!' অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকাল গেনা, 'কী তুই একটা! জুল ভার্নের "পৃথিবী থেকে চাঁদে", "চন্দ্র প্রদক্ষিণ" বই পড়িসনি?'
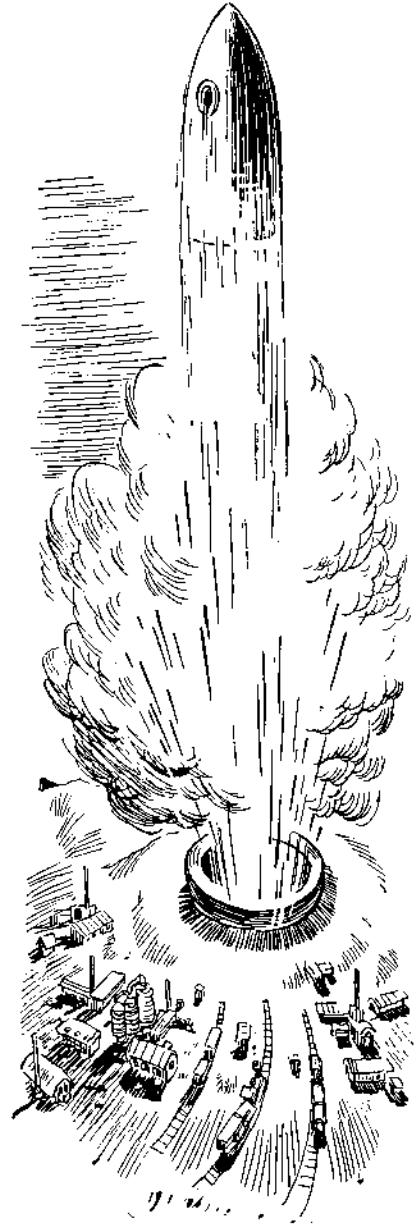
'কথায় বাধা দিস নে!' ওকে থামাল বরকা, 'আমি নিজেই বলব। মোট কথায় ওতে আছে কামান ক্লাবের সভাপতি বারবিকেনের গল্প। মানে, চাঁদে কী করে সে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিলে একটা গোলা পাঠাতে চেয়েছিল সেই কথা। মস্ত এক কামান বানালে তারা "কলম্বিয়াদা"। কামান ছোড়ার দিন ঠিক হল। লোকজন জড়ো হল সব — মেঘ করেছিল। সবাই অপেক্ষা করে আছে কখন চাঁদ উঠবে। শেষ পর্যন্ত চাঁদ উঠল। তারপর জেমিনি তারকা মণ্ডলীর কাছে আসতেই কামান দাগা হল। ছুটে গেল গোলা ...'

'কিন্তু চাঁদ পর্যন্ত পেঁছিল না!' হো হো করে হেসে উঠল গেনা।

'কিন্তু পেঁছিল না কেন, কেন পেঁছিল না?' হতাশ হয়ে উঠল ল্যুবকা, 'কী চমৎকার হত তাহলে ...'

'বাজে কথা বলিস না!' পা ঠুকল বরকা, 'গোলা উড়ে পেঁছিল চাঁদে। জুল ভার্নের বইয়ে স্পষ্ট লেখা আছে: উড়ে পেঁছিল।'

'জুল ভার্নে যাই থাক, আসলে ...'

'কী আসলে? তোর মতে তাহলে কী হল আসলে?' কান খাড়া করল বরকা।

'আসলে,' বুঝিয়ে বলতে শুরু করল গেনা, 'চাঁদে গোলা দাগা কোনো কামানের কম্ম নয়। তার জন্যে দরকার প্রচণ্ড স্পীড — সেকেণ্ডে এগারো কিলোমিটার। আর তুই জানিস কামানের গোলা কতখানি ছোটে সেকেণ্ডে? জানিস তুই?' আক্রমণ শুরু করল সে।

'হ্যাঁ জানি। সেকেণ্ডে তিন কিলোমিটার। দাদার কাছে শুনেছি।'

'হ্যাঁ, ঐ তিন কিলোমিটার। তবেই বুঝে দ্যাখ — চাঁদে পেঁছবে তা? ডোবায় গিয়ে পড়বে!'

'সাবধান বলছি,' হুঁশিয়ার করে দিলে বরকা।

'রাগ করছিস কেন? এত হল আমাদের আলোচনা, গ্রীকেরা যা বলে বিশুদ্ধ তর্ক।'

'আলোচনাই তো,' খুশি হয়ে বললে ল্যুবকা।

'বিশুদ্ধ তর্কই যদি হয়,' জুল ভার্নের সমর্থক বললে চটে উঠে, 'তাহলে এটা কেন ধরছিস না যে "কলম্বিয়াদা" একটা সাধারণ কামান নয়, বিশেষ রকমের কামান, তিনশ মিটার লম্বা।'

'সে তো আরো খারাপ,' শান্তভাবে আপত্তি করল গেনা, 'ও থেকে দাগলে তোর বারবিকেন আর তার বন্ধু বান্ধবরা সব চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেত। বলবি, না? ফরাসী বৈজ্ঞানিক রবের এনো-পেলত্রি'র কথাও মানবি না বল? ইনিও জুল ভার্নের বই পড়েছেন, সব কিছু হিসাব করে দেখেছেন ... উনি বলেছেন, কামানের নল অত লম্বা হলে ত্বরণ হবে প্রচণ্ড, আর গোলকের মধ্যে

বসা লোকেদের ওজন দাঁড়াত তাদের স্বাভাবিক ওজনের কয়েক হাজার গুণ। বুঝতে পারিস? তোর ঐ সভাপতির মাথার টুপিটারই ওজন দাঁড়াত কয়েক টন, তাতেই পিষে যেত সে!'

'তাই কখনো হয়!' আধা বিশ্বাসে আধা অবিশ্বাসে বলে উঠল ল্যুবকা।

'তার মানে, তোর ধারণা, আমি মিছে কথা বলছি? নাকি বিজ্ঞানীরা সব মিছে কথা বলেছেন? এহ্, খুকী কোথাকার!' এর চেয়ে ধিক্কারজনক কথা আর গেনা খুঁজে পেল না। খুকী ঠোঁট ফোলালে।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক রবের এনো-পেলত্রি'র নামটা অবশ্য খুবই ভারিক্কি গোছের। তাহলেও জুল ভার্নের পক্ষ সমর্থন করে গেল বরকা। চন্দ্র যাত্রার সমস্ত পরিস্থিতিগুলো ও মনে মনে যাচাই করে দেখল, গেনার সিদ্ধান্ত টেকে কিনা। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেল সে:

'জল! জল!' এমনভাবে ও চেঁচিয়ে উঠল যেন একেবারে এক তপ্ত মরুভূমিতে রয়েছে সে।

'বরকা,' চিন্তিতভাবে বললে ল্যুবকা, 'অসুখ করেছে তোর?'

কিন্তু হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলে বরকা।

উত্তেজিতভাবে বললে, 'বুঝেছিস? জলের কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। গোলার ভেতরে মেঝের ওপর শুয়ে ছিল ওরা, আর মেঝের নিচে জল। জলের জন্যে বেঁচে যায় ওরা, বুঝেছিস?'

'জলের বালিশ? তা মন্দ নয়!' অপ্রত্যাশিতভাবে সায় দিল তার্কিক, 'তবে খুব খুশি হবার কারণ নেই। তাহলেও চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। তবে আইডিয়াটা ঠিক। ৎসিওলকভস্কিও ভেবেছিলেন, ধাক্কা থেকে বাঁচাতে পারে জল। মহাকাশযাত্রী যদি জলের টবের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে বেঁচে যাবে। মোটের ওপর ৎসিওলকভস্কি সবই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।'

ল্যুবকা ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলে, 'সেই জন্যেই তুই স্কুলে ৎসিওলকভস্কির মতো কানে না শোনার ভান করিস বুঝি?'

গেনা ভাব করলে যেন কথাটা ওর কানে যায়নি।

'"আন্দ্রোমেদার কুয়াশা" বইতে ইয়েফ্রেমভ ...' ওদের একজন শুরু করেছিল কিন্তু ল্যুবকার আর সহ্য হল না, বললে:

'ইয়েফ্রেমভ, ৎসিওলকভস্কি খুব হয়েছে বাবা, পা একেবারে জমে গেল।'

'কিন্তু আমরা এখন ভারহীনতার একটা পরীক্ষা করব, গাও গরম করে নেব,' ঘোষণা করলে গেনা। কাউন্টারের ওপর চেপে সে উঠে গেল চালাটার ছাদে।

বরকাও গেল তার পিছু পিছু। তারপর ওরা দুজনে টেনে তুললে ল্যুবকাকে।

'আমি প্রথম,' এই বলে ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে লাফ দিলে ল্যুবকা।

'কী রকম লাগছিল তোর? ভারহীনতা টের পেয়েছিলি?' ছাদের ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল গেনা।

নিচে বরফের স্তূপের মধ্যে কী একটা নড়ে চড়ে উঠল, হাঁচল।

'টের পাচ্ছি...' ল্যুবকার নাকী কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওদের কাছে, 'টের পাচ্ছি যে হাঁটুতে কালশিটে পড়বে।'

'দাঁড়া আসছি এক্ষুনি!' দুই তার্কিক লাফ দিলে। এমনভাবেই ওরা পড়ল যে ভারহীনতা বোধ করার অবকাশ মিলল না।

'তেমন উঁচু নয় তো,' ৎসিওলকভস্কির শিষ্য বললে বুঝিয়ে।

'তেমন নয়,' দম নিয়ে বললে জুল ভার্নের সমর্থক।

ল্যুবকা ততক্ষণে বরফের মধ্যে থেকে উঠে যাত্রা শুরু করেছে বাড়ির দিকে।

সিঁড়ির চত্বরটায় এসে মহাকাশযাত্রীরা একটু সুস্থ বোধ করলে।

'জুল ভার্নও ভারহীনতার কথা লিখেছেন,' বরকা বলে চলল এমনভাবে যেন কিছুই হয়নি, 'কল্পনা কর — ক্ষেপণকের মধ্যে ওরা ভাসছে যেন জলের মধ্যে মাছ, দিয়ানা নামে ওদের একটা কুকুরও আছে সঙ্গে। তারপর মদ খেতে লাগল। গেলাস টেলাস সব রাখল স্রেফ শূন্যে, তারপর বোতল থেকে মদ ঢেলে খাওয়া হল।'

'কিন্তু কিছুই খেতে পারল না,' যেন নিজের মনে মনেই যোগ করল গেনা।

'ফের, ফের তুই খুঁত ধরতে শুরু করেছিস!' মুখিয়ে এল লুবকা।

'খেতে পারল না,' গোঁয়ারের মতো পুনরাবৃত্তি করল গেনা, 'গেলাস থেকে মদ লাফিয়ে উঠত, বিন্দু বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে যেত, গিয়ে পড়ত চোখে কানে নাকে — সর্বত্র, সবারই শুরু হয়ে যেত হাঁচি কাশি, এমন কি নিউমোনিয়াও বাদ যেত না। তোর বারবিকেন জানত না যে ভারহীনতার অবস্থায় তরল পদার্থ পাত্রে রাখা যায় না। আমি যদি মাস্টার হতাম, তাহলে ফেল করিয়ে দিতাম তাকে।'

'আর তুই ভুলে গেছিস যে বারবিকেন একশ বছর আগেকার লোক?' মনে পড়িয়ে দিল কামান গোলার ভক্ত।

গেনা কী একটা ভাবলে, টুপিটা টেনে নিলে কপালের ওপর, তারপর গণিতজ্ঞের সুরে বললে:

'পত্রিকায় লিখব: সঙ্গত কারণেই তরল পদার্থের ওপর ভারহীনতার ক্রিয়া কী তা শিক্ষার্থী বারবিকেনের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। বাস। ফেল করার কথা বাদ দিচ্ছি।'

'আমিও হার মানছি,' বললে বরকা, 'কামান আজকাল অচল হয়ে যাচ্ছে। তাহলেও জুল ভার্নকে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে।'

'উড়তে হলে রকেট, কোনো ভুল নেই,' প্রস্তাব করল গেনা, 'দেখলি তো রকেট "স্বপ্ন" কীভাবে উড়ে গেল সূর্যের দিকে। সারা দুনিয়া বাহবা দিচ্ছে, আর এ সবই তো ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন ৎসিওলকভস্কি

তাঁর সমস্ত সূত্র খেটে গেছে। আমার বাবা বলে, ৎসিওলকভস্কি হলেন জেট টেকনিকের গুরু। তাই নির্ভয়ে ওড়া যাবে।'

'খুব তো বলছিস ওড়া যাবে। আর খাবে কী সেখানে?' ব্যস্ত হয়ে উঠল ল্যুবকা।

'কী আবার খাবি — কলা খাবি। মিষ্টি শাঁসালো সুগন্ধি কলা। কলা ফলবে হটহাউসে। হিহি করে হাসবার কিছু নেই। স্বয়ং ৎসিওলকভস্কি বলে গেছেন, ব্যোমযানের ভেতরে হটহাউস করার কথা। কলার কথাও লিখে গেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য ক্লরেলা খেয়ে থাকাই পছন্দ করি। নাম শুনেছিস কখনো ক্লরেলার? এ হল এককোষী এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ। সব রকমের ভিটামিন ওর মধ্যে আছে পুরো মাত্রায়। আর জানিস কী রকম বাড়ে। এক দিনের মধ্যেই বেড়ে যাবে হাজার গুণ। আমিও বাড়িতেই ক্লরেলার চাষ করছি।'

'তুই চাষ করছিস? কোথায়?' একবাক্যে প্রশ্ন করে উঠল শ্রোতারা।

'অ্যাকোয়ারিয়মে। দেখবি? আয় আমার সঙ্গে।'

গেনার পড়ার টেবলটা যেন একটা ছোট্ট ল্যাবরেটরি। ফ্লাস্ক, টিউব, বকযন্ত্র ও এমন সব নানাবিধ জিনিস যা প্রথম দৃষ্টিতে দেখে মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাবে না — তা সংখ্যায় এত যে কেবল ল্যাবরেটরিতেই দেখা যায়। একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলায় ছড়িয়ে আছে ফ্লাস্কগুলো। আর ক্লাসের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ভারপ্রাপ্তা হিসাবে অবিলম্বেই ল্যুবকার মন গেল সেদিকে। কিন্তু গেনা তাকে ভয়ানক একটা ঘোষণা করে থামিয়ে দিলে। বললে, এমন কি ৎসিওলকভস্কির কাজের ঘরও ছিল ভারি অগোছালো। টেবলের উপর কাউকেও হাত দিতে দিতেন না তিনি।

'এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই আছে এক বিশেষ শৃঙ্খলা,' সগর্বে বললে গেনা, 'যা দরকার সব হাতের কাছে আছে আমার।'

ক্লরেলা জিনিসটা দেখা গেল খানিকটা সবজেটে ন্যালসানির মতো, আকর্ষণীয় কিছু নয়। ভাসছে অ্যাকোয়ারিয়মের মধ্যে, স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের ঢাকনা দেওয়া তাতে। ঢাকনার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা কাচের বাঁকা নল, সেটা গেছে জল ভরা একটা বয়ামের মধ্যে। সেই জলের মধ্যে একটা ফ্লাস্কের মুখের সঙ্গে তা লাগানো। এই অদ্ভুত সরঞ্জামটাকে অতিথিরা যখন দেখছিল, ততক্ষণে গেনা রান্নাঘর থেকে নিয়ে এল একটা ধূমায়িত কাঠের টুকরো।

'এক্ষুনি দেখাচ্ছি, ক্লরেলার কত গুণ,' এই বলে গেনা ফ্লাস্কটা নিয়ে তার মধ্যে ধূমায়িত কাঠটা ফেলে দিলে। ফ্লাস্কের মধ্যে স্থির অকম্প শিখায় জ্বলতে লাগল কাঠটা।

'দেখলি তো? অক্সিজেন! O_2। এ অক্সিজেন ছাড়ছে ক্লরেলা। মহাকাশযাত্রীর পক্ষে এ উদ্ভিদ হল রত্ন। খাওয়াও চলবে। আমি খেয়ে দেখেছি — মন্দ নয়... বোস না, অমন ঠায়

দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমি তোদের দেখাব জলভরা কামরার মধ্যে মহাকাশযাত্রীর ওড়া। মা,' খোলা দরজা দিয়ে চ্যাঁচাল গেনা, 'একটা ডিম দাও তো আমায়!'

এ প্রার্থনার জবাব এল না।

'একটু দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি,' বলে চলে গেল গেনা।

অতিথিরা যদি রান্নাঘরে তখন উঁকি দিত, তাহলে তারা দেখতে পেত, বলা ভালো, শুনতে পেত নিচের কাণ্ডটা:

'মা, ডিম দাও একটা!'

'বললাম যে ডিম নেই।'

'আমি জানি, আছে।'

'আর আমি বলছি, নেই।'

'বেশ!' গেনা চেয়ারের ওপর চেপে উঠল দুয়োরের মাথায়। তারপর দরজার ওপর পেট দিয়ে এদিকে মাথা ওদিকে পা রেখে ঝুলতে থাকল। চরমপত্র দানের মতো করে ও ঘোষণা করলে, 'না দিলে রাত পর্যন্ত এইভাবেই ঝুলে থাকব।'

মচমচ করছিল দুয়োর। মা নীরবে ক্রীম ফেটাতে লাগল। আর বীরের মতো মাথা নিচু করে ঝুলতে থাকল গেনা।

'অকাল-কুষ্মাণ্ড কোথাকার!' সক্রোধে বলে উঠল মা, 'নে, ভাগ!'

লাফিয়ে নামল গেনা, ডিম, মগ আর নুনদানি নিয়ে আলুথালু চেহারায় ফিরে এল। ধৈর্য ধরে তার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছিল বন্ধুরা, বিজয় গর্বে ডিমটা সে দেখালে তাদের।

'তোদের চোখের সামনেই জলের মধ্যে নুন গলাচ্ছি। জল ভরা মগটা হল জলভর্তি কেবিন,' ব্যাখ্যা করে বোঝালে পরীক্ষক, 'ডিমটা হল গে
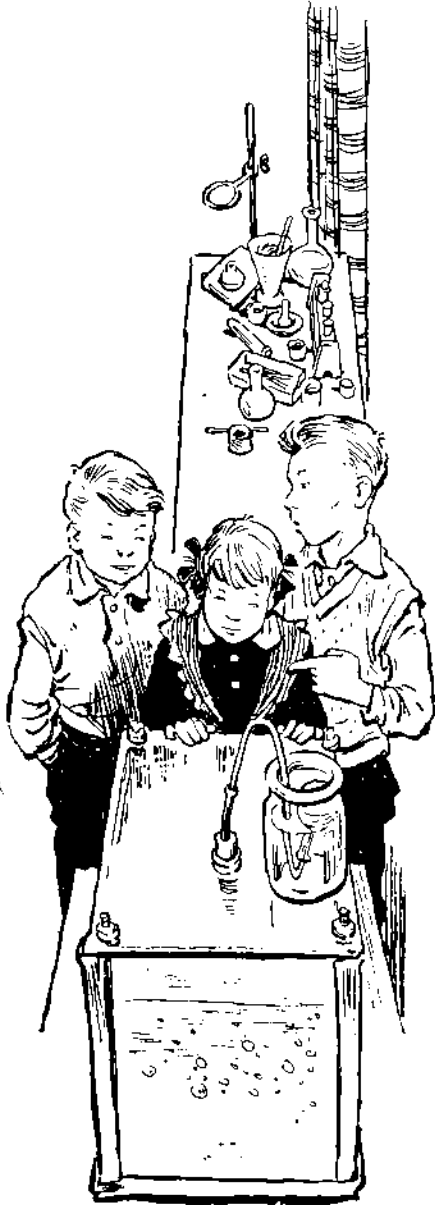
মহাকাশযাত্রী। মহাকাশযাত্রীকে কেবিনে রাখা হল... এবার... ' সর্শক্তিতে গেনা মগটা ঠুকল জানলার বাজুতে।

ল্যুবকা বলে উঠল, 'মা গো!'

মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল খানিকটা জল।

'দ্যাখ এবার, মহাকাশযাত্রীর কোনো ক্ষতি হয়নি। হাত দিয়ে দেখতে পারিস,' অনুমতি দিলে গেনা।

মগের মধ্যে তাকাল ওরা।

ডিমটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বরকা সমর্থন করলে, 'সত্যি, একটা ফাটলও নেই। তুই গেনা একজন প্রফেসর রে!'

'আমি নই,' সাধুর মতো স্বীকার করল গেনা, 'এটা ৎসিওলকভস্কির আবিষ্কার। তিনিই পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তোরা যদি আমার কাছে ঘন ঘন আসিস, তাহলে আরো অনেক কিছু দেখাতে পারি তোদের...' তারপর হঠাৎ করেই বলে বসল, 'আয়, আমরা একসঙ্গে দল বাঁধি, কী বলিস?'

উত্তেজনায় গালে রঙ ধরল ল্যুবকার: হল তাহলে! একের পর এক, দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল সে: দুজনেই বিব্রত এবং খুশি।

গেনা বললে, 'সাধারণত কক্ষনো ছাড়াছাড়ি হব না আমরা, বেশ?'

'বেশ,' রাজী হল বরকা।

'বেশ,' সমর্থন করে গেনার হাতে তালি দিলে ল্যুবকা।

...ঝুম! সদর দরজার কাছে এক চাঙ বরফ পড়ল ছাদ থেকে। জানলায় জানলায় আলো নিভছে। সবুজ ঐ আলোটাও মিটমিট করে নিভে গেল, সবাইকে জানিয়ে দিলে বরকা স্মেলভ ঘুমচ্ছে।

ঝুম!.. ফের সব চুপচাপ। কী হল? বরফ খসে

পড়ল ছাদ থেকে নাকি টেবলের ওপর ঝন ঝন করে উঠল ফ্লাস্ক? বিছানায় উশখুশ করে গেনা কারাতভ। তারপর মাথা তুলতেই দেখে: সিল্কের আলখাল্লা পরে চীনা মান্দারিন বাং হু চেয়ারে বসে বসে দুলছে। মস্ত দুটো ড্রাগন শান্তভাবে শুয়ে আছে তার পায়ের কাছে।

"কামান নাকি রকেট, কামান নাকি রকেট?" দুলতে দুলতে জিজ্ঞেস করে মান্দারিন, গলার স্বরটা তার সেই চালাঘরের আমুদে আগন্তুকটার মতো; মাথার সরু বেণীটা কাঁপছে।

"রকেট নয়ত কি, নিশ্চয় রকেট!" বলতে চায় গেনা, কিন্তু ওর ঠোঁট কাঁপলেও শব্দ বেরয় না।

আরো জোরে জোরে দুলাতে থাকে মান্দারিন, আরো ফুলে উঠতে থাকে ড্রাগনদুটো। চেয়ারে বসা বাং হু'কে তারা উঠিয়ে নিল মেঝে থেকে। ঝন ঝনাৎ... খুলে গেল জানলা, আকাশের দিকে উড়ে গেল ড্রাগনদুটো। সোনালী চমক দিয়ে উঠল বাং হু'র সিল্কের আলখাল্লা আর গেনা দেখতে পেলে, কোলের মধ্যে তার বরকার কুকুর তিয়াপা। "থামুন, থামুন একটু!" জোরে চিৎকার করে উঠতেই জেগে গেল গেনা।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। চেয়ারটা যথাস্থানেই আছে। জানলা দিয়ে দেয়ালের ওপর এসে পড়েছে রাস্তার দোলায়মান ল্যাম্পের একটু হলদেটে আলো। "স্বপ্ন দেখছিলাম," হাঁপ ছাড়ল গেনা, "তাহলেও তিয়াপাকে কিন্তু খুঁজে বার করতে হবে।"

তিন... দুই... স্টার্ট!

গত বছরের শুকনো বাদামী হয়ে ওঠা ঘাসে একটা প্রহরীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রকেট। ছুঁচলো মুখটা আকাশের দিকে, নীল গম্বুজটার ঠিক মধ্য বিন্দুতে। ওপর থেকে খোলা গবাক্ষের কালো চোখটা তাকিয়ে আছে মসৃণ প্রান্তরের দিকে, ব্যস্তসমস্ত মনুষ্যমূর্তিগুলোর দিকে, রকেটের সুঠাম দেহ বরাবর লাইন বেয়ে ওঠা লিফটের কেবিনের দিকে, নিচু নিচু মোটরগাড়ির দিকে।

কাজ করছে না শুধু একটি মানুষ, কোনো তাড়াহুড়ো যেন তার নেই। উঁচু হাই বুট পরে পা ফাঁক করে সে নিচ থেকে চেয়ে আছে ওপরে, কালো চোখ গবাক্ষটার দিকে।

লোকটি দ্রোনভ। কিছুই সে করছে না কারণ সে ইঞ্জিনিয়র নয়, টেকনিশিয়ানও নয়। তারা ছোটাছুটি করছে রকেটের চারপাশে, উঠছে লিফটে, পর্যবেক্ষণ করছে, চারিদিক থেকে পরখ করে দেখছে তাদের আদরের বাচ্চাটিকে। ডাক্তার অপেক্ষা করছে তার নিজের সময়ের জন্যে। শুধু তো দেখবার জন্যে সে আসেনি!
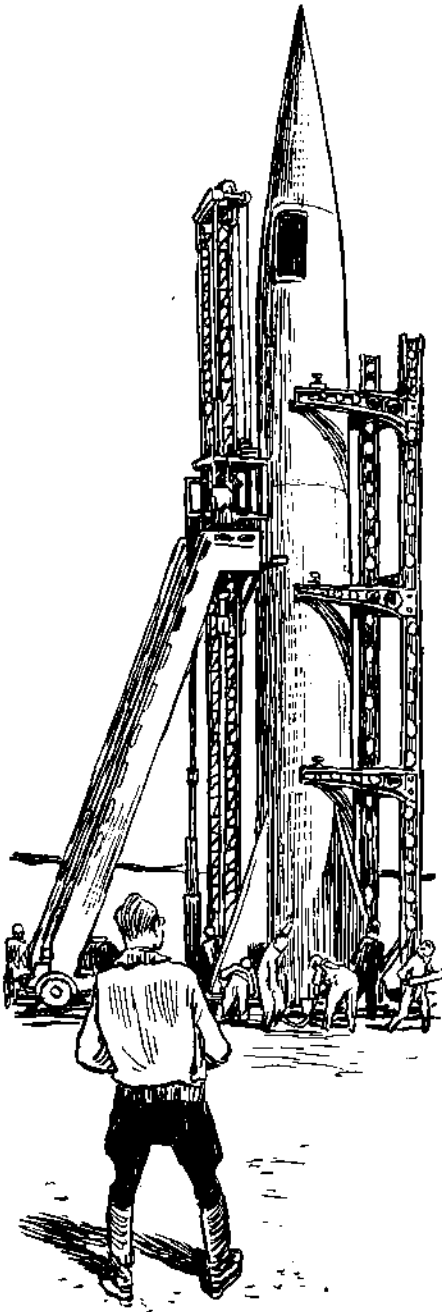
"একচক্ষু দানব!" কালো গবাক্ষওয়ালা বিরাট রুপোলী নলটার দিকে সানন্দে তাকিয়ে ভাবছিল দ্রোনভ, "অপরূপ একচক্ষু মহাকায়! কত যে তোর আপন জনক জননী ধাত্রীর সংখ্যা... দিন রাত্রি ধরে তোর কথা ভেবেছে বৈজ্ঞানিকরা। ইঞ্জিনিয়র টেকনিশিয়ানরা তোর এই চেহারায় তোকে গড়ে তুলেছে কাগজের পাতায় — ড্র্যাফট হিসাবে, ছক হিসাবে, সংখ্যা হিসাবে। তোর মস্ত ইস্পাতের দেহটায় এখনো লেগে আছে শ্রমিকদের হাতের তাপ। আর তোর মজবুৎ হার্ট — তোর যে ইঞ্জিনে জ্বলছে হাজারো ডিগ্রির তাপ, সেটাকে বানিয়ে তোলা হয়েছে ধাতুবিদ্যার চুল্লিতে। আর রক্ত — তরল আগুনে রক্তটা তোর দেহে ঢেলে দিয়েছে রাসায়নিকরা। কিন্তু মাথাটা যদি তোর না থাকত, তাহলে কোথায় উড়তিস তুই মহাদেহী? পদার্থবিদদের চমৎকার সব সরঞ্জাম আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিগুলোকে ধন্যবাদ দে। গাণিতিকদের স্তুতিও করতে হবে বৈকি, তোর প্রতিটি পদক্ষেপ তারা গুণে রেখেছে।

"রকেট, দ্যাখ কত তোর মা বাপ। সবাইকে মনে রাখাই দায়। রকেট মানে ইতালীয় ভাষায় সাধারণ একটা নল, এই নাম যখন ইতালিয়ানরা তোকে দেয়, তখন নিশ্চয় তারা ভাবতে পারেনি এমন পরাক্রান্ত হয়ে উঠবি তুই। এক্ষুনি থর থর করে কেঁপে উঠবে মাটি। দুনিয়া কাঁপবে রুশী রূপকথার সেই মহাবীর ইলিয়া মুরোমেৎস ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতে ছুটে এসেছে বলে নয়, কাঁপবে কারণ তুই মাটি ঠেলে দিয়ে উঠে যাবি ওপরে, তোর একটা চোখ দিয়ে আরো কাছ থেকে তাকিয়ে দেখবি তারাগুলোকে। চমৎকার!"

'সময় হয়ে এসেছে,' দ্রোনভের ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গেল কার একটা কণ্ঠস্বরে।

এসে দাঁড়াল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আর ভালিয়া। কোলে তাদের কুকুর। দুজনের গায়েই ল্যাবরেটরির শাদা আলখাল্লা: কিছুক্ষণ আগে রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে আকাশযাত্রীদের, ওজন নেওয়া হয়েছে, ফিতের ওপর রেকর্ড করা হয়েছে হার্টের স্পন্দন, টেম্পারেচার মাপা হয়েছে। খে'কুরে আর পাম ইতিমধ্যেই ট্রে'র সঙ্গে বেল্ট বে'ধে তৈরি — দেখাচ্ছে দুটি ছোটো ছোটো প্যারাশুটিস্টের মতো — বেশ শান্ত হয়েই আছে তারা। দ্রোনভকে দেখে চিনতে পেরে একটু লেজ নাড়লে কেবল।

দ্রোনভ বললে, 'সময় হয়ে এসেছে।'

রকেটের দিকে এগিয়ে গেল তারা।

লিফটের কেবিন উঠে গেল ওপরে। কুকুররা দেখল কেবল হলদে ঘাসগুলো কী দ্রুত সরে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে, আর তাদের বিদায় দিতে এসেছে যারা তারা কিন্তু তাকালে ওপরের দিকে।

খোলা গবাক্ষের সামনে থামল লিফট। কেবিনের ভেতর ট্রে ফিট করল ডাক্তাররা। পোষাকের তল থেকে আসা কানেকটিং তারগুলোকে যোগ করলে যন্ত্রের সঙ্গে। সব কিছু যাচাই করে দেখলে। ফের আর একবার মন দিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হল যাত্রী কেবিন।

টুপির মতো দেখতে এই ছোটো কেবিনটার ভেতরে সব কিছুরই আয়োজন রাখা হয়েছে। সে যেন একটা আলাদা দুনিয়া। তাপ থেকে বাঁচানোর জন্যে ফেল্টের স্টাফিং — ওড়বার সময় রকেট উনুনে চাপানো কেটলির চেয়ে কম গরম হবে না। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে অক্সিজেন সিলিণ্ডার, তাতে বাতাস

মেশানো। কণ্ট্রোলার কলকব্জা। কুকুরের দৈহিক অবস্থা সব তাতে রেকর্ড হয়ে যাবে টেপে, আর রেডিও যোগে পাঠাবে নিচে। আর আছে মহাকাশযাত্রীর লড়ুয়ে সহচর — অ্যাক্সেলেরোগ্রাফ; বিদ্যুৎ তরঙ্গে স্পন্দিত রেখা ফুটবে তার টেপের ওপর, বোঝা যাবে অদৃশ্য শক্তির চাপটা কেমন। আর যাত্রীদের ঠিক মাথার ওপরেই ঝুলছে কিনো ক্যামেরা — ওড়বার প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের ছবি তুলে যাবে এ ক্যামেরা। সেই সঙ্গে ছবি তুলবে ঘড়ির — ডাক্তাররা যাতে বুঝতে পারে, ঠিক কোন সময়ে কী ঘটেছিল; ফিল্মের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবে কলকব্জার রেকর্ড।

প্যারাশুটটা কিন্তু ডাক্তারদের চোখে পড়ল না। মেঝের নিচে শক্ত করে সেটা ফিট করা আছে কোথাও। যখন দরকার পড়বে আপনি খুলে যাবে।

'তা কেমন দেখলে?' জিজ্ঞেস করলে দ্রোনভ।

'আমার মতে তো চমৎকার,' উত্তর দিলে ভার্সিলি ভাসিলিয়েভিচ, 'তু-১০৪ প্যাসেঞ্জার এরোপ্লেনের চেয়ে খারাপ নয়। তাহলে কী, স্টুয়ার্ডেস? চলি।'

'ফের দেখা হবে খেঁকুরে, আসি পাম!' বিদায় জানালে ভালিয়া, 'ছটফট করিস নে, ভালোই উৎরোবে।'

'ফের দেখা হবে,' বললে অন্যেরা।

গবাক্ষ বন্ধ হল ঢাকনায়। ভ্রমণের সময় দেখবার জন্যে যাত্রীদের রইল শুধু ক্ষুদে প্লেটের চেয়েও ছোট্ট একটু জানলা। তার ভেতর দিয়ে একে একে উঁকি দিয়ে দেখল ভালিয়া, দ্রোনভ, ভাসিলি ভার্সিলিয়েভিচ। তারপর নিচে নেমে এল তারা। ছোট্ট বৃত্তটা দিয়ে দেখা যেতে থাকল কেবল নীল আকাশ।

ট্রে'র ওপর মাথা টান করে পাশাপাশি শুয়ে রইল কুকুরদুটো। শান্তভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগল খেঁকুরে। পামের মুখখানা নির্বিকার — জোর করে হাই তুলছে সে। এমনি ভাবেই অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল তারা, সন্দেহই হল না যে ঘটনাটার জন্যে তাদের এতদিন ধরে তৈরি করা হয়েছে, সেটা শুরু হয়ে গেছে: ইনস্ট্রুমেণ্টগুলো শুরু করে দিয়েছে তাদের রিপোর্টাজ, অক্সিজেন সিলিণ্ডার বাতাস ছাড়ছে, মাথার ওপর টিকটিক করতে শুরু করেছে কিনো ক্যামেরা।

রকেটের চারপাশের মাঠটা জনশূন্য হয়ে গেল। কংক্রিট সিঁড়ি দিয়ে লোকেরা নেমে এল শেলটারে, তার ওপর ঝিক ঝিক করছে স্টেরিওটিউবের কাচ। টেকনিশিয়ানরা চলে এল সবচেয়ে শেষে।

শেলটারটায় বেশ ভিড়। তাহলেও দ্রোনভ ভাবলে, "কী ভালোই হত যদি ওভারঅল পরা, মজুরের পোষাক পরা আরো লোক আসত এখানে। এক মিনিটের জন্যেও যদি তারা দেখ

মেসিন ছেড়ে, চুল্লি ছেড়ে, ল্যাবরেটরির ফ্লাস্ক ছেড়ে, ড্র্যাফটিং'এর বোর্ড ছেড়ে এসে দেখে যেতে পারত তাদের নিজের হাতের এই কীর্তিটাকে, ক্লান্ত মুখ ভরে উঠত হাসিতে। না, আসবে না ওরা। কাজে ব্যস্ত। ওদের সন্তান তো শুধু এই একটি নয় ..."

রকেট ছাড়ার সময় হয়ে এল। ইঞ্জিনিয়ররা চলে গেছে তাদের নিজের নিজের জায়গায়, ইনস্ট্রুমেণ্টের কাছে, সুইচের কাছে। মুখ তাদের শান্ত। অপেক্ষা করে আছে কেবল চোখ আর হাত — কম্যাণ্ডার যখন প্রধান সুইচটায় চাপ দেবে — স্টার্ট।

সব মনোযোগ তার দিকে। কোনো কথা নেই কারো মুখে। অটুট নীরবতা। বড়ো বড়ো সেকেণ্ড ঘড়ির কাঁটাটা কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে টিকটিক করে।

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বুঝে উঠতে পারে না কম্যাণ্ডারের কোনো চাঞ্চল্য নেই কেন। স্কুলের অঙ্কের মাস্টার হিসেবে তাঁকে মনে আছে তার: কামানো মাথা, পুরুষ্টু চেহারা, গায়ে একটা ঘরোয়া জ্যাকেট। অঙ্কের মাস্টার সর্বদাই শান্ত, এমন কি ইনস্পেকশনের সময়েও, যখন সারা ক্লাস গুন গুন করত। অঙ্কের মাস্টারকে তবু বোঝা যায়, কিন্তু এই অচঞ্চল কম্যাণ্ডার — রকেটের কোথাও কিছু গোলমাল হবে না এমন স্থির বিশ্বাস উনি পেলেন কোথা থেকে?

হঠাৎ কম্যাণ্ডারের গলা শোনা গেল:

'রেডি!'

সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চেঁচিয়ে গুণতে শুরু করলেন:
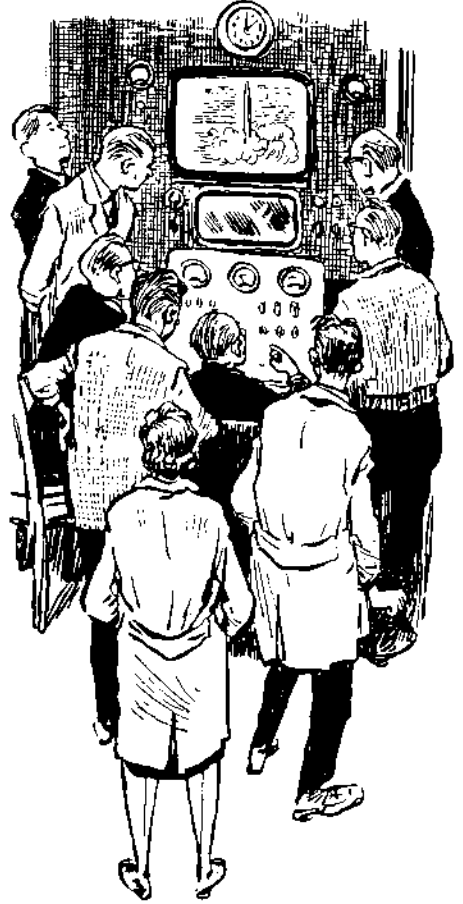
'পাঁচ ... চার ... তিন ... দুই ... স্টার্ট!'

টেলিভিজনের স্ক্রীনে দর্শকরা দেখল, আগুনের ঝলকে আলোকিত হয়ে উঠল রকেটের নিচটা, ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে গেল তার গা। তারপরেই উড়ে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ — আছড়ে পড়ল শেলটারের দুয়োরে। হ্যাঁ, জোর বটে।

রকেট ধীরে ধীরে, যেন আপন মনে, খানিকটা উপরে উঠে গেল ধোঁয়ার মেঘ ভেদ করে, আগুনের ধারা ছাড়ল, তারপর উত্তপ্ত গ্যাসের ঝকঝকে গোলাপী একটা থামের ওপর ভর দিয়ে ছুটল আকাশে, প্রতি সেকেণ্ডে বাড়তে থাকল তার গতি। বিদ্যুতের মতো সোনালী ঝিলিক দিয়ে ছোট্ট হয়ে গেল একটা ঝকমকে বিন্দুতে।

সঙ্গে সঙ্গে ইওলকিনের মনে পড়ল তার নিজের যন্ত্রের কথা। সে দিকে ছুটে যেতেই বাধা পেল মানুষের দেয়ালে।

পরাক্রান্ত এই ক্ষেপণকের সেবকেরা — মজুর টেকনিশিয়ান ইঞ্জিনিয়ররা, সবাই গিয়ে ভিড় করে ঘিরে দাঁড়াল সবজে মতো স্ক্রীনটার সামনে, চঞ্চল আলোক তরঙ্গ থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ ফেরাল না। কিছুই বুঝল না তারা কিন্তু দেখতে থাকল গভীর মনোযোগে। ছুটন্ত তরঙ্গে খবর আসছে যাত্রীদের।

পা মাড়িয়ে মাপ চেয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ এগিয়ে যাচ্ছিল তার যন্ত্রের দিকে। পিঠে তার কিল মারলে ভালিয়া: তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! ক্ষোভে তার চোখে জল এসে পড়েছিল আর কি: যন্ত্রের ভাষা আয়ত্ত করার শিক্ষা নিয়েছে সে, ইনস্টিটিউটের পরীক্ষায় পাশ করেছে, কিন্তু কিছুই দেখার উপায় নেই। যন্ত্র অবশ্য সবই রেকর্ড করে চলবে, টেপ সে পরেও বারবার করে পড়বে, কিন্তু ও যে নিতান্তই একটা হাঁদা তাতে সন্দেহ নেই। দ্রোনভের বেশ মজা, আগে ভাগে সে আন্দাজ করে গিয়ে জায়গা নিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত স্ক্রীনের সামনে গিয়ে পৌঁছল দুজনে, তারপর থেকে জায়গা ছেড়ে নড়েনি।

রকেটে তখন ঘটছিল এই।

আচমকা প্রচণ্ড একটা গর্জন এসে পড়ল যাত্রীদের ওপর। এদিক ওদিক মাথা নাড়াতে লাগল তারা, ধরবার চেষ্টা করছিল কোত্থেকে আসছে এই বিদঘুটে উত্ত্যক্ত করা আওয়াজটা। কিন্তু টের পেল না যে এটা তাদের যাত্রার সঙ্গীত, আকাশে উড়ছে তারা!

শক্ত করে বন্ধ করা কেবিনটাকে ওদিকে কেবলি উড়িয়ে নিয়ে চলেছে রকেট। নিজের যাত্রাপথে সে অটল, সে পথ গেছে বিমানের উচ্চতা ও রুট ছাড়িয়ে; মেঘ ফুঁড়ে উঠে রকেট পৌঁছল স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সেই উচ্চ স্তরে, যেখানে ফুলকিতে ফুলকিতে জ্বলে ওঠে উল্কা আর আমাদের রাস্তার নিওন ল্যাম্পের বিজ্ঞাপনের মতোই অনায়াসে ঝলক দেয় মেরুজ্যোতির রঙ বদল। কিন্তু এই সব অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক জায়গাগুলোতেও থামল না রকেট, নিজের পথ

ধরে উঠে গেল আরো উঁচুতে যেখানে আমাদের পরিচিত বাতাসের বদলে আছে কেবল অদৃশ্য গ্যাস কণিকা; নিরেট করে বন্ধ কেবিনের মধ্যে লুকিয়ে না থাকলে যেখানে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের যাত্রীদের মৃত্যু অনিবার্য।

খুবই দুঃখের কথা যে খেঁকুরে আর পাম তাদের গোল জানলাটা দিয়ে বাইরে দেখতে পারছিল না। প্রথমে ওরা কেবল থর থর করেছে ভাইব্রেশনের কাঁপুনিতে, তারপর অদৃশ্য গুরুভার কে যেন তাদের মাথাটা নিচে ঠেসে বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে বসেছে তাদের ওপর। বুক চেপে গেল কুকুরগুলোর, ঢিপ ঢিপ করতে লাগল হার্ট, সমস্ত দেহ হয়ে উঠল লোহার মতো ভারি। কিন্তু ভয় পেলে না তারা, শান্ত হয়ে শুয়ে রইল। হঠাৎ থেমে গেল ইঞ্জিন...

কল্পনা করো, হঠাৎ যেন তুমি উড়ে গেলে সিলিঙের কাছে বেলুনের মতো। মেঝের ওপর দাঁড়াতে যাবে হঠাৎ উড়ে গেলে বাতাসে।

আমাদের যাত্রীদের ব্যাপারেও ঠিক তাই ঘটল। আশ্চর্য নরম সবল হাতে কে যেন তুলে নিল তাদের। পা মাথা লেজ কিছুই যেন তাদের নেই। পালকের চেয়েও হালকা। বেল্টে বাঁধা না থাকলে উড়ে বেড়াতে পারত পাখির মতো।

রগড় দ্যাখো! এমন অভিজ্ঞতা লোকের হয় কেবল স্বপ্নে।

এই অদ্ভুত ব্যাপারে খুশি হয়ে উঠল খেঁকুরে, চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল ফুর্তিতে। জানলা দিয়ে তাকাল সে। দেখা গেল মিশ কালো একটা আকাশ আর ঝকঝকে চোখ ধাঁধানো সূর্য। যেমন ভীষণ, তেমনি সুন্দর।

তারপর কেবিনের চারদিকে তাকাল খেঁকুরে, গবাক্ষ দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। সে রোদ গিয়ে পড়েছে সামনের দেয়ালে, সেখান থেকে ঝলক দিচ্ছে। রোদের ছোপটা কিছুক্ষণ এক জায়গায় থেকে দেয়াল বেয়ে এসে পড়ল খেঁকুরের বাঁ চোখে। চোখ মিটমিট করলে খেঁকুরে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল, মাথা ঝাঁকাল, তারপর যখন চোখ মেলল, দেখল রোদ্দুরের পোঁচটা গিয়ে বসেছে সিলিঙে। সেখানেও স্থির হয়ে রইল না, কেবলি জায়গা বদলাতে লাগল।

খেঁকুরের চোখদুটো হয়ে এল আধবোঁজা, লেজ নড়তে লাগল সানন্দে আর গলা দিয়ে ছোট্ট যে আওয়াজটা বেরল সেটা ঠিক 'হিহি' করে হাসির মতো।

খেঁকুরে নির্ভয়ে খেলায় মাতল, রোদ্দুরের ছোপটার ইঙ্গিত কিন্তু সে বুঝল না। ওর জায়গায় মানুষ থাকলে সে অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝত আলোর ছোপটা সিলিং থেকে মেঝেয় যে নেমে এসেছে সেটা অকারণে নয়। ভারহীনতার অবস্থায় মহাকাশযাত্রী বুঝবে কী করে কোনটা 'ওপর' কোনটা 'নীচ', নিজে থাকে নিশ্চল হয়ে, গতি টেরই পায় না। সূর্যের রোদটা কিন্তু বলছিল, "ইঞ্জিন বন্ধ হবার পর তোমাদের রকেটটা প্রথমে উঁচুতে উঠছিল তারপর থেমে

গিয়ে ঘুরে নাক নিচের দিকে করে এখন মাটিতে নামছে। এবার এসে পড়বে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরের দিকে। সাবধান! সাবধান কিন্তু!"

রোদ্দুরের ছোপটা ঠিকই বলেছিল। মস্ত একটা বাঁক দিয়ে সূর্যের সামনে সারা দেহটা ঘুরিয়ে নিল রকেটটা, তারপর পাক খেতে খেতে নামতে শুরু করল।

মাটির ওপর ডাক্তাররাও জানত, এইবার সবচেয়ে বিপদের লড়াই। নামবার সময় রকেট জটিল পাক খেতে লাগল। পাহাড় গড়িয়ে একটা পিপে নামবার সময় যেমন হয়, তেমনি। ভেতরে যারা আছে তাদের কী হবে?

এক্ষুনি, এক্ষুনি যদি প্যারাশুটটা খুলে যায়, তবেই রক্ষা।

আর সত্যিই তাই। কী একটা যেন গোপন সংকেত পেয়ে অদৃশ্য শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়ল খেঁকুরে আর পামের ওপর; হাত পা বাঁধা কুকুরদুটোকে পিটতে তার একটুও লজ্জা হল না, ঘুসির পর ঘুসি পড়তে লাগল তাদের ওপর। ধকধক করতে লাগল বুক, ব্যথা করতে লাগল পিঠ, পেটের ভেতর সব যেন খামচে ধরল। মাথায় ঘা খেয়ে অন্ধকার হয়ে এল চোখ। আর পিছন থেকে ঘা খেয়ে রক্ত আবার ছুটে এল মাথায়, আর লালচে ছোপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল দৃষ্টির সম্মুখে। নভোযাত্রায় ভারহীনতার কয়েক মিনিটের আনন্দের জন্যে এবার যেন প্রতিশোধ নিতে শুরু করল অদৃশ্য শত্রুরা। কুকুরদুটো কিন্তু সবই সহ্য করে গেল, এমন

কি অমন উদাসীন বিধাতা যে যন্ত্র, সেই যন্ত্রও যখন অত বেদম ধাক্কা সইতে না পেরে রেকর্ডিং বন্ধ করে দিলে, তখনও সয়ে গেল তারা।

শেলটার থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ডাক্তাররা। তাদের পেছু পেছু বাকিরা। শান্ত পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের চোখ টনটন করতে লাগল; পড়ন্ত রকেটটার চিহ্ন নেই কোথাও।

মাথার শিরা দপদপ করতে লাগল: কোথায়, গেল কোথায় ?

নীল শূন্যে শেষপর্যন্ত দেখা গেল একটা সরু ধোঁয়াটে ফিতে — রকেটের জ্বলন্ত মাথাটার প্রায় অদৃশ্য একটা রেখা। একবার চোখে পড়েই মিলিয়ে গেল। আকাশ ফের ফাঁকা, একেবারে আকাশের নিচের মাঠটার মতোই।

তারপর দপ করে উঁচুতে ঝলক দিয়ে উঠল একটা শাদা রুমাল। ঝলক দিল, কিন্তু অদৃশ্য হল না। আস্তে আস্তে একটা পালের মতো ফুলে উঠল তা, ধীরে ধীরে নামতে লাগল মাটির দিকে — ব্রেক কষছিল। প্যারাশুটের আঁটো গম্বুজ, আর যে মহার্ঘ বোঝাটা সে নামিয়ে দিচ্ছিল — রকেটের তিনকোণা সেই প্রান্তটুকু আরো পরিষ্কার করে এবার দেখতে পেলে সবাই।

চারিদিকে রোদ্দুর, উৎকর্ণ নীরবতা। অনেক উঁচুতে কোথায় যেন গান গাইছে একটা ভরত পাখি।

কথা নেই লোকগুলোর মুখে, জায়গা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল তারা। সবার আগে ধবধব করছিল ডাক্তারদের উড়ন্ত শাদা ওভারঅলগুলো।
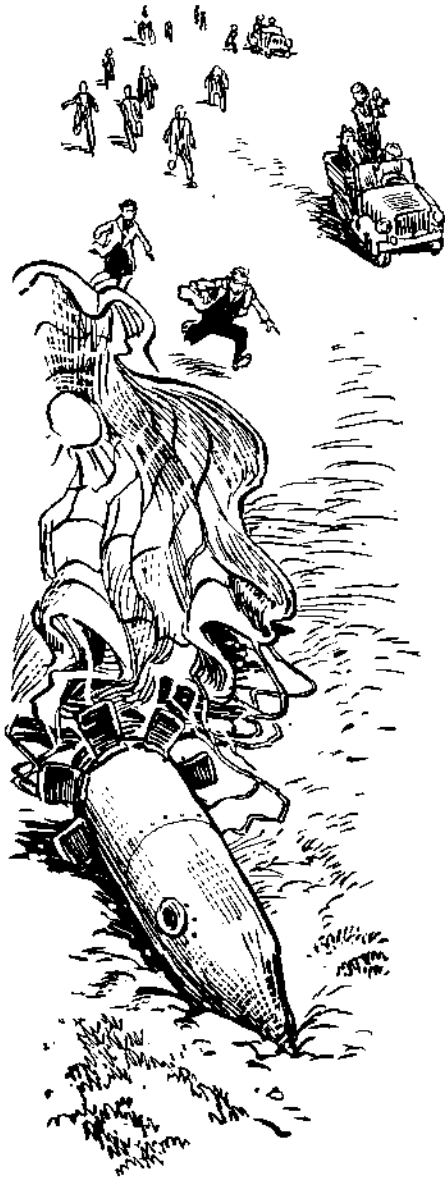
ঐ যে তাড়াতাড়ি — রকেট রক্ষার পালটার দিকে!

মোটর গোঁ গোঁ করে এসে পেঁছিল ছুটন্ত লোকেদের কাছে। কেউ কেউ উঠে বসল জীপ গাড়িতে, কেউ হাত নেড়ে পায়ে হেঁটেই ছুটতে লাগল।

ইঞ্জিনিয়ররা এসে প্যারাশুটটা খুলে ফেলল। দ্রনোভ আর ইওলকিন একই সঙ্গে গবাক্ষের কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখল: বেঁচে আছে কি?

'বেঁচে আছে?' সশঙ্কে জিজ্ঞেস করল ভালিয়া, ধৈর্য রাখতে না পেরে পা ঠুকতে লাগল সে, 'আরে, কিছু বলছেন না কেন, তাড়াতাড়ি!'

উত্তর দিলে না ডাক্তাররা। তাড়াতাড়ি করে তারা ঢাকনা সরাতে লাগল, যাত্রী সমেত স্ট্রেদুটোকে বার করে আনল। বেল্ট খুলতে লাগল।

'হিপ হিপ হুররে! বেঁচে আছে!' চেঁচিয়ে উঠে সামনের একটা লোকের কাঁধ ঝাঁকাতে লাগল ভালিয়া, লোকটা সম্ভবত ইঞ্জিনিয়র, 'হিপ হিপ হুররে, কমরেডরা!'

ইঞ্জিনিয়র উবু হয়ে বসে পরখ করছিল তার রকেটটাকে, বোঝা যায় আর কোনো দিকে তার চোখ নেই। ভালিয়ার কথা কিছুই তার মাথায় ঢুকল না যেন, বিব্রতের মতো চোখ মিটমিট করল কেবল।

'আচ্ছা লোক আপনি!' আহতভাবে বললে ভালিয়া। 'ওরা বেঁচে আছে যে! কিচ্ছু হয়নি।'

'হ্যাঁ, খুবই ভালো কথা বৈকি!' সজাগ হয়ে শেষপর্যন্ত উঠে দাঁড়াল ইঞ্জিনিয়র, 'অভিনন্দন নিন।' ভালিয়ার করমর্দন করল সে, তারপর

ডাক্তারদের। 'অভিনন্দন! অভিনন্দন নিন সবাই! সত্যিকারের উৎসব আজ! তবে মাফ করবেন, আমায় এমন যেতে হচ্ছে।'

ইঞ্জিনিয়র ফের গিয়ে বসল নলটার কাছে, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ক্ষুব্ধ হয়েছে সে। দ্রনোভ ইঞ্জিনিয়রের অবস্থাটা বুঝেছিল — রকেটের নামাটা পুরোপুরি সফল হয়নি; বিশেষজ্ঞরা যা বলে — সাবলীল নয়।

তাহলেও সাবাস এই রকেট স্রষ্টারা: যাত্রীরা অটুট, অক্ষত! আমেরিকান রকেট 'ফাউ-২' 'আয়েরোবি' কতবারই তো ভেস্তে গেছে, মারা পড়েছে তার ভেতরকার বাঁদররা। কিন্তু খেঁকুরে আর পাম — এই তো হাজির। পাশে তাদের রক্ষক, রকেট। না, যাই বলো না কেন, এই কালো হয়ে আসা তপ্ত নলটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করা উচিত। বিগড়ে যাওয়া বিমানকে ল্যান্ড করিয়ে তার গায়ে যেভাবে চাপড় মেরে আদর করে বৈমানিক...

মাটির ওপর বসে আছে পাম, হাঁপাচ্ছে। লকলক করছে লম্বা লালচে জিভটা — ঘটনাটা কাঁপিয়ে দিয়েছে তাকে। খেঁকুরে কিন্তু পায়ের ওপর খাড়া, চান করার পর যেমন করে তেমনি করে সতেজে গা ঝাড়া দিচ্ছে, রোদ্দুরের গরম, বাসন্তী মাটির গন্ধ, সবুজ ঘাস, পরিচিত সোহাগী গলার স্বরে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। ডাক ছেড়ে সে ছুটে আসে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের কাছে, তার ট্রাউজারের ওপর লাফিয়ে পড়ে, জটিল সব লাফঝাঁপ শুরু দেয় সে, কেবিনের মধ্যে রোদ্দুরের সেই ছোপটার মতো। ভেতরে তার যেন একটা স্প্রীং খুলে যাচ্ছে, যা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

আনন্দের এই উদ্দাম নাচ দেখে ভালিয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচও চুপ করে থাকে না, তার সঙ্গে তাল রেখে হঠাৎ মোটা গলায় হাসতে থাকে সে। আর চোখ জ্বল জ্বল করে দ্রনোভের। এসে দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ ইঞ্জিনিয়র। তার মুখেও হাসি ফোটে। তারপর এসে জোটে আরো আরো অনেক লোক। ফুর্তির সংক্রমণ লাগে সবার মধ্যে।

'কীরে বেটি, তাহলে লাগাই আমাদের রুশী নাচ!' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে আর সবাই তাকিয়ে দেখে: এ সেই সবচেয়ে নির্বিকার মানুষটা, রকেট ক্ষেপণের কম্যান্ডার।

কিন্তু ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে ভালিয়া, বন্ধ হল নাচ। বাধ্যের মতো খেঁকুরে ছুটে গেল তার ডিশের দিকে। পামও উঠল মাটি ছেড়ে, খুট খুট করে চলল তার পিছু পিছু। তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শুরু করল কুকুরদুটো। আহারের শেষ হল এক টুকরো সসেজে, তার লোভে খেঁকুরে সাগ্রহে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ঠিক সার্কাসের ট্রেনিং পাওয়া কুকুরের মতো। ও যেন বলতে চায়, "দেখলেন তো, যাত্রার কষ্টেও আমার খিদে মরেনি।"

'ভারি চিটিংবাজ তুই খেঁকুরে,' ভর্ৎসনা করে মাথা দোলায় ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

'সে কী, কেন?' জিজ্ঞেস করেন ক্ষেপণের কম্যাণ্ডার, 'খেঁকুরে? খেঁকুরে কেন? এমন বাহাদুর, ফুর্তিবাজ কুকুর — আর তার নাম কিনা খেঁকুরে?'

কী বলবে ভেবে পেল না ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। ওকে বাঁচাল দ্রোনভ, বললে, 'ব্যাপার কী জানেন, ওটা হল সাবেকী নাম। আসলে ওকে এখন ডাকে অন্য নামে ... বেপরোয়া। সত্যি মন্দ নয়, কী বলেন, বেপরোয়া!'

যশের খেয়াল

"সাহসী, বেপরোয়া সন্ধানীদের জয়!" লোকে যখন অনায়াসে মহাজগতে ভ্রমণ করবে তখন বলবে এ কথা। বলবে, "ধন্যবাদ তোদের চারপেয়ে ব্যোমযাত্রীরা! প্রথম স্পুৎনিকের কথা লোকে জানবার আগেই তোরা যাত্রা করেছিলি রকেটে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোরা পরখ করে দেখেছিস কেবিন আর ফ্লাইং স্যুটের মজবুতি, ধূর্ত শক্তির আঘাত তোরা মাথা পেতে নিয়েছিস প্রথম, ভরসা রেখেছিলি ভারহীন অবস্থার রহস্যময় নৈঃশব্দে, সে অবস্থা কেবল কল্পনার মতো, স্বপ্নের মতো, আর কখনো সখনো মাটিতে নেমেও বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে, কখন হেলিকপ্টার এসে খোঁজ নেবে তোদের। তারপর ফের সব শুরু হয়েছে প্রথম থেকে — ট্রেনিং, যাত্রা, ফের ট্রেনিং। তোদের বুকের প্রতিটি স্পন্দন রেকর্ড হয়ে আছে মহাজাগতিক ডাক্তারির বইয়ে; সে বই বৃহৎ, মানবের পক্ষে অতি জরুরী। এই সব রেকর্ড থেকে বৈজ্ঞানিকেরা বার করেছেন নিরাপদ উড্ডয়নের নিয়ম, সে নিয়ম এনে দিয়েছেন মহাকাশযাত্রীদের জন্যে। ধন্য তোরা!"

রকেটড্রোম থেকে ইনস্টিটিউটে ফিরে এই সব কথা ভাবছিল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

তার ভাবনায় বাধা দিলে দ্রোনভ। বললে, 'জানেন হে বন্ধুদল, আপনাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি: একেবারে ছেলেমানুষ আপনারা!'

'কী বলছেন?' অবাক হল ভালিয়া।

'খুবই সোজা কথা,' বললে দ্রোনভ, 'পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। দেখছেন তো নাকে ছুলি ফুটে উঠেছে। লোকে বলে বসন্ত এলে বাচ্চাদের নাকেই কেবল ঐ ধরনের ছুলি দেখা যায়। আর সত্যি বসন্তই এসে গেছে!' জানলার দিকে দেখাল দ্রোনভ।

তাপ আর আলোয় ভরা শহরের মধ্য দিয়ে মোটরে করে যাচ্ছিল ওরা। বসন্তের বরফ গলা জলের মধ্যে লাফালাফি করছিল বাচ্চারা, জলের মধ্যে সূর্যের ছটা। লোকজনের আশেপাশে সবকিছুই চমক দিচ্ছে, ঝলক দিচ্ছে। চোখ মিটমিট করতে হচ্ছে সবাইকে, আর আকাশের

দিকে তাকালে মনে হচ্ছে যেন ঝকঝকে নীল পটের ওপর কোন এক বেপরোয়া শিল্পী কালো কালিতে কলমের এক এক টানে এ'কে দিয়েছে কতকগুলো ক্রেনের সিলুয়েট।

আধঘণ্টা পরে ওরা গিয়ে আসন নিলে প্রফেসরের সামনে। রিপোর্ট দিলে দ্রোনভ:

'কুকুরদুটো উঠেছিল ২১২ কিলোমিটার উ'চুতে। যাত্রার সক্রিয় অংশটায় নাড়ীচলাচল, নিঃশ্বাস, রক্তচাপ বেড়ে ওঠে। ভারহীনতার অবস্থায় তা ক্রমশ নেমে আসে, কিন্তু ল্যাবরেটরির চেয়ে ধীরে। বোঝা যায়, ভারহীনতার অবস্থায় অবাক হয়ে যায় ওরা।'

'আপনার মন্তব্য কী?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'রকেট নামার সময় ব্রেকটা আমার মনে হয় খুব মসৃণভাবে কাজ করেনি। আমাদের প্রায় কোনো রেকর্ডই নেই, যন্ত্র বিগড়ে যায়। ত্রাণ ব্যবস্থাটা আরো উন্নত করতে হবে কনস্ট্রাকটরদের। কোনো রকম একটা স্প্রিং টিং গোছের কিছু আবিষ্কার করা দরকার। নইলে 'শুইয়ে-দিলেই-উঠে- বসে' পুতুলগুলোর মতো একটা কেবিনের ব্যবস্থা, যেটা উল্টে যাবে না।'

'ঠিক কী করবে সেটা ওদের ব্যাপার,' প্রফেসর বললেন, 'তবে আপনার বক্তব্যটা কাজে লাগাবার মতো। কনস্ট্রাকটরদের ওটা অবশ্যই জানিয়ে দেব ... কুকুরদের গায়ে কোনো রকম ক্ষত বা রক্তক্ষরণ কিছু দেখা যায়নি?'

'না, কোনো ক্ষতি হয়নি ওদের। জানেন তো,' হেসে ফেলল দ্রোনভ, 'খে'কুরেটা দেখা গেল বেশ বাহাদুর। আমরা ওর নাম বদলে দেব বলেই ঠিক করেছি। নাম রাখব বেপরোয়া। আপনি কী বলেন?'

'ইনস্টিটিউটে তার জন্যে কোনো বিশেষ নির্দেশপত্র জারী করা হবে না,' রহস্য করে বললেন প্রফেসর, 'তবে এমন কাজ দেখিয়েছে যখন, তখন বেশ, আপত্তি নেই। অবশ্য ভালোই শোনাবে। সংবাদপত্রের পক্ষেও কৌতূহল জাগাবার মতো। ওদিকে সব এসে পড়েছে সাংবাদিকরা: লাইকার বোনটিকে দেখিয়ে দেবেন — আমাদের নতুন যশস্বিনী। কাজ করার আর উপায় নেই। ভালো কথা, ফিল্মও তুলছে ওরা। ক্যামেরাম্যানকে একটু সাহায্য করবেন যেন, অন্তত আপনি এটা দেখবেন, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।'

এই আলাপের কিছু পরেই ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে এসে ধরল একজন অপরিচিত লোক, গায়ে একটা হলদে মৃগচর্ম জ্যাকেট, মাথায় স্পোর্টসম্যান টুপি।

'আপনিই তো আসছেন রকেটড্রোম থেকে?' জিজ্ঞেস করল সে, 'পরিচয় দিয়ে নিই: আমি ক্যামেরাম্যান কুলিক। আপনি আগেই হয়ত শুনেছেন। আপনাকে আমাদের ভারি দরকার। কুকুরদুটো কোথায় আপনার? নিশ্চয় সাহায্য করবেন আমাদের।'

লোকটার গলার স্বরে এতটুকু দ্বিধা নেই। এমন কি প্রশ্নের মধ্যেও এমন একটা সুর যে আপত্তি করার জো নেই।

ইওলাকিন কুকুরদুটোকে নিয়ে এল। কালকের ব্যোমনাবিকরা সানন্দেই ছুটোছুটি করতে লাগল আঙিনায়, শুঁকে বেড়াতে লাগল কাঠ, বাড়ির আনাচ কানাচ, পথ।

'শিষ্ট শান্ত জন্তু নিয়ে কাজ করে আরাম আছে,' কিনো ক্যামেরা বাগিয়ে বললে কুলিক, 'একবার ইয়াল্‌তায় বাঁদরের ছবি নিতে হয়েছিল। জ্বালিয়ে মেরেছিল একেবারে। ভয়ানক বদখেয়ালী বাঁদরটা। আমার ক্যামেরার ঝিঁঝিঁ ডাকা শব্দে ক্ষেপে উঠছিল কেবলি। প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, এই বুঝি এসে কামড় দেয় আমার নাকে। ভয়ানক হিংস্র। খাঁটি একখান বুলডগ!'

'আপনার ফিল্মটা আমি দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে,' বললে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ 'নামটা বোধ হয় "মহাজগতে রেনা", তাই না? ফিল্মটা ভালোই লেগেছিল। ওতে খুব সঠিকভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে মহাজগতের সন্ধানে বাঁদর উপযুক্ত।'

'ও সবই ঠিক, তবে তারপর থেকে বাঁদর আমার আর সহ্য হয় না,' একটা গোপন কথা বলার মতো করে বললে কুলিক, 'আপনারা কুকুর বেছে ভালোই করেছেন। আমেরিকানরা কিন্তু বাঁদরকে ট্রেনিং দিয়ে আকাশে ছাড়ছে...'

'হ্যাঁ, বাঁদরই ওদের পছন্দ।'

'আন্দাজ করতে পারছি, কী ঝামেলায় না পড়তে হচ্ছে বেচারিদের।'

'বাঁদরকে ট্রেনিং দেওয়া বেশি কঠিন,' সমর্থন করলে ইওলকিন, 'বাঁদরের রক্তের চাপ মাপতে হলে ওদের বসাতে হয় সচল দেওয়ালের খাঁচায়, নইলে ইনস্ট্রুমেণ্টই ভেঙে দেবে। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে বাঁদর ভারি রগচটা স্নায়ুনির্ভর প্রাণী। স্টিমারের জোরালো শব্দে শিম্পাঞ্জি মরে গেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে।'

'আমাদের ডাক্তারি বিদ্যা,' উপসংহার টানল ক্যামেরাম্যান, 'অন্য মহাকাশসন্ধানীদের বেছে ভালোই করেছে। এবার কুকুরগুলোকে কাছে ডাকুন একবার।'

বাধ্যের মতো ছুটে এল কুকুরদুটো।

'এটা হল বেপরোয়া,' পরিচয় দিলে ডাক্তার, 'আর এই যে কালো কান — এটার নাম পাম।'

'পরিচয় হয়ে গেল,' ক্যামেরা তুললে কুলিক, 'এবার ধরুন এই রকম: ওরা যেন মহাকাশ-যাত্রার পর সদ্য সদ্য ফিরেছে। কী করবে ওরা? আনন্দে লাফ দেবে তো। একটু লাফাতে বলুন ওদের।'

'মাপ করবেন,' হাত নেড়ে বাধা দিল ডাক্তার, 'ওরা তো সার্কাসের কুকুর নয়। তাছাড়া, বেপরোয়া অবশ্য সত্যিই লাফালাফি করেছিল, কিন্তু পাম অনেকক্ষণ ধরে ধাতস্থ হতে পারেনি, কোনো কিছুর দিকেই তার মন ছিল না।'

'আমাদের দরকার ফিলিং, বুঝলেন না, ভাবাবেগ!' বেশ দৃঢ় স্বরেই বললে কুলিক, 'দুজনেই লাফাতে শুরু করুক। নইলে খুব নীরস হবে ফিল্মটা। আপনি একটু সাহায্য করুন ভাই।'

'বলছেন যখন, বেশ —' নিস্পৃহ গলায় সায় দিল ডাক্তার, 'খেঁকুরে, পাম — আয় আমার কাছে।'

'এখানে খেঁকুরে আবার কে?' ব্যস্ত হয়ে উঠল কুলিক।

'ভাবনা নেই,' ওকে শান্ত করল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, 'এটা হল বেপরোয়ার আগেকার নাম। নতুন নামটা ওর এখনো অভ্যেস হয়নি।'

কুকুরদুটো প্রথমে বোঝেনি কী চাওয়া হচ্ছে তাদের কাছ থেকে, বোকার মতো পেছনের পায়ে দাঁড়াল ভর দিয়ে। তারপর নড়ে চড়ে লাফালাফি শুরু করলে বটে, কিন্তু সবুজ ঘাস দেখে খেঁকুরে যে উদ্দাম আনন্দে মেতে উঠেছিল, মোটেই সে রকম হল না। বোঝা গেল ক্যামেরাম্যান নিজেও তার ছবিতে খুব খুশি হতে পারল না। তাহলেও মিষ্টি প্রাণীদুটোর তারিফ করলে সে, আগের মতোই গাল দিলে বাঁদরকে।

পরের দিন সকালে ইওলকিনের ঘরে উজ্জ্বল মুখে এসে হাজির হল কুলিক, চ্যাঁচালে:

'এমন রত্নটিকে আপনি লুকিয়ে রেখেছেন কী বলে! অভিনন্দন ভাই, অভিনন্দন! এ যে একেবারে চিত্রলোকের তারকা! বুঝতে পারছেন?'

'কার কথা বলছেন?' ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ডাক্তার।

'চলুন, ভাই, উঠুন! খানিকটা ট্রেনিং'এর ব্যবস্থা করে দিন। মস্ত এক প্ল্যান ফেঁদেছি। দর্শকদের হাততালি একেবারে অবধারিত।'
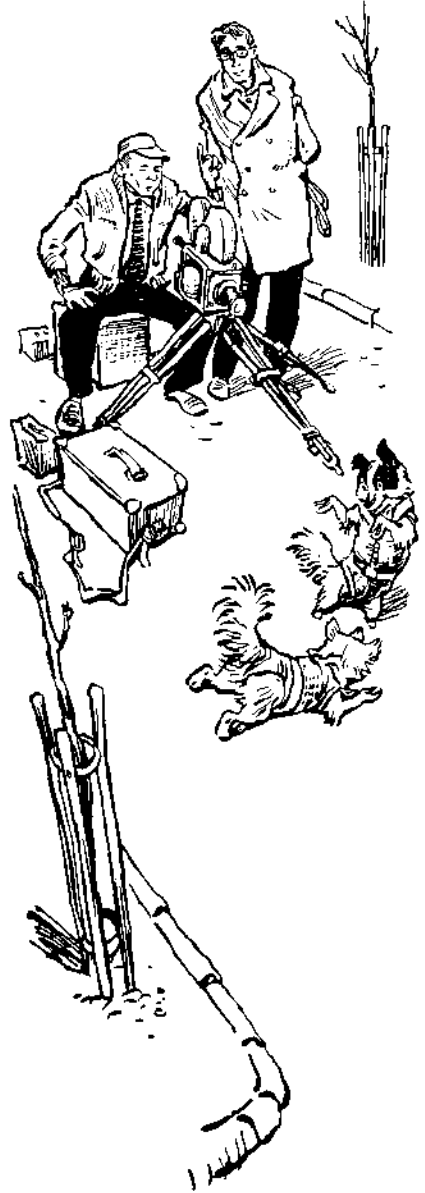
প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। গাধাবোটের মতো ডাক্তারকে পেছন পেছন টেনে নিয়ে এল কুলিক। যেতে যেতে তার আবিষ্কারের বর্ণনা দিলে খুব রঙীন করে। তাহলেও কার কথা বলা হচ্ছে ডাক্তার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না, যতক্ষণ না খাঁচার মধ্যে লম্ফমান গুবরের সামনে গিয়ে তারা থামল।

বিজয় গর্বে সে বললে, 'এই যে! ফিল্মকে ধন্য করে দেবে এটি। চেয়ে দেখুন: খাঁটি একটি চিত্রতারকা নয় কি? আপত্তি করতে পারে কেউ?'

সেই মুহূর্ত থেকে কুলিক একেবারে সমারোহে কাজ শুরু করল। ইনস্টিটিউটে সে আসত তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে। ডাক্তারদের বলত, ওর দিকে কোনো মন দেবার দরকার নেই, নিজের নিজের কাজ করে যান তাঁরা। আর আসলে নিজে সব কাজেই ব্যাঘাত ঘটাত বৈকি। ক্যামেরা নিয়ে শুয়ে দেখত মেঝেতে, নয়ত উঠে যেত একেবারে সিলিঙের কাছে, সবচেয়ে অসাধারণ একটা অ্যাঙ্গেল নেবার চেষ্টা করত, বলত এটা সরান, ওটা নিয়ে যান, সম্ভব হলে অমুক অমুক ছাড়া আর সকলে যেন এক মিনিটের মতো ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে যায়। ওর ওপরে রাগ করত না কেউ, মন ঢেলেই ছবি তুলত সে।

গুবরের ছবি ও তুলল সবচেয়ে বেশি, তার ন্যাকামির মধ্যেই অদ্বিতীয় এক একটা মুহূর্তের সন্ধান করত সে। ডাক্তররা বৃথাই তাকে বললে যে ওর চেয়েও বেশি গুণী ক্যান্ডিডেট আছে, ওদের মতে ছবির নায়ক হওয়া উচিত চারপেয়ে মহাকাশযাত্রীদের এই গোটা দলটা। কিন্তু অটল সংকল্প কুলিকের, মনোরম মুখ আর ব্যঞ্জনাভরা লেজওয়ালা একটি নতুন চিত্রতারকা সে বিশ্বকে উপহার দেবেই।

'প্রতিশোধ নেওয়া গেছে!' একদিন সে বললে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে।

ইওলকিন বললে, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'রেনা — সেই বদখেয়ালী ধূর্ত জীবটির এবার উচিত শাস্তি হয়েছে। এবার বুঝতে পারছেন?' বলে উঠল কুলিক। তারপর ডাক্তারের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে বোঝালে: 'না, না, আমার সঙ্গে এর কোনো সংস্পর্শ নেই। রাস্তায় সোফিয়া লেপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর কি। রেনার ট্রেনার। তার কাছ থেকেই শুনলাম, ন্যায়ের জয় সর্বদাই।'

কুলিকের কাহিনীটা এই:

সিনেমায় ছবি তোলার পর দিনের পর দিন রেনার চরিত্র নষ্ট হতে থাকে। খুব খিটখিটে হয়ে যায়, রিহার্সালের সময় ট্রেনারের কথা শুনত না, দর্শকদের সামনে ওকে দিয়ে খেলা দেখাতে হয়রান হয়ে যেত সোফিয়া। রেনার সার্কাসী জীবন একদিন শেষ হয়ে গেল কারণ অনুষ্ঠানের সময় সে ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে তিনজন খালাসী ও সার্কাসের ডিরেক্টরকে কামড়ে দেয়। কী করা যায় ওকে নিয়ে? সংশোধনের বাইরে চলে যাওয়া এই জীবটিকে দিয়ে দেওয়া হয় চলমান পশু-সার্কাসের কাছে। তারপর থেকে ভূতপূর্ব মনিব তাকে আর দেখেনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সোফিয়া লেপ শুনেছে যে বুড়ো বুড়ো সিংহ, খোঁড়া খোঁড়া হাতি আর ক্যাঁককেঁকে সব কাকাতুয়ার দঙ্গলের সঙ্গে খাঁচায় করে রেনা নানান শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁদরটা মুখ ভ্যাঙচায়, নানান ধরনের কসরত দেখিয়ে বাচ্চাদের কাছ থেকে লজেন্স চায়। বাচ্চারা ওকে সানন্দেই লজেন্স খেতে দেয়, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে না যে এই ভেঙচি-কাটা বাঁদরটাই হল সেই রেনা — যে একদা সিনেমার পর্দায় হেলমেট পরে গগলস্'এর মধ্যে দিয়ে তাকাত তাদের দিকে...

'"ভূত নেমে গেছে বলে অভিনন্দন জানাই," মন খুলেই বললাম সোফিয়া লেপকে,' বলে চলল কুলিক, 'সোফিয়া বললে, "ধন্যবাদ, কিন্তু এখন আমি কাকাতুয়াদের ট্রেনিং দিচ্ছি। আর ওদের ঠোঁট ঠিক বাঘের থাবার মতোই বিপজ্জনক।" সত্যি সাহস আছে মেয়েটার!'

এই আলাপটার পর সোরগোলে ক্যামেরাম্যানটিকে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আর দেখেনি: ইনস্টিটিউটে ছবি তোলার কাজ তার হয়ে গিয়েছিল। কুকুরগুলোকে নিয়ে ইনস্টিটিউটের চিরাচরিত কাজ আবার চলতে থাকল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তোড়জোড় হচ্ছিল নতুন মহাকাশযাত্রার।

কিন্তু নতুন যাত্রার দরকারটা কী? লাইকা যা আবিষ্কার করে দিয়ে গেছে সে কী কম? বেপরোয়া, পাম ও অন্যান্য কুকুর যে নিরাপদে মাটিতে ফিরে এল তাতেও হল না?

ডাক্তারদের কাছে এখনো এটা যথেষ্ট নয়, যদিও মহাজাগতিক ডাক্তারি বিদ্যার বহু

পাতাই ভরে উঠেছে রেকর্ডে। এর প্রথম পাতাটা ডাক্তারেরা ভর্তি করেছিল ১৯৪৯ সালে যখন চারপেয়ে পরীক্ষাধীন প্রাণী নিয়ে আমাদের দেশে প্রথম রকেট ছাড়া হয়েছিল। মহাজাগতিক ডাক্তারি বিদ্যা তারপর বছরের পর বছর পর্যবেক্ষণ আর রেকর্ড মিলিয়ে দেখেছে, বার করেছে নতুন বিজ্ঞানটির নিয়মাদি — মহাকাশযাত্রায় নিরাপত্তার সূত্র। মানবজাতির জন্যে অত্যন্ত জরুরী এই সব নিয়মের পেছনে ছিল আমাদের পরিচিতদের — দ্রোনভ, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, ভালিয়া — এদেরও মেহনত।

ডাক্তাররা এখন ভালোই জানে অদৃশ্য শত্রুর সামনে — ভাইব্রেশনের কাঁপুনির সামনে, অতিভারের সামনে, নিম্ন চাপের সামনে কী আচরণ করেছে কুকুরেরা। এই প্রতিটি ব্যাপারকে আলাদা আলাদা করেই শুধু তারা খতিয়ে দেখেনি। কিনো ক্যামেরার ফিল্মে আর অটোমেটিক রেকর্ডিং'এর টেপে তারা যাত্রার পুরো ছবিটাই পেয়ে গেল — শত্রু যখন পরীক্ষাধীনকে নিঃশ্বাস ফেলার সময় না দিয়ে একের পর এক এসে আক্রমণ করে। এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারত যে মোটের ওপর মহাকাশযাত্রা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নয়, আর মহাকাশযাত্রীর সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল ভারহীনতার পরে, রকেটের ব্রেক কষার সময়কার অতিভার।

কিন্তু তখনো ডাক্তাররা জানত না মহাকাশযাত্রীর পাঁচ নম্বর শত্রু মহাজাগতিক রশ্মির বিপদ কতটা। ব্যালিস্টিক রকেটে মহাকাশযাত্রীরা এ রশ্মির যতটুকু সাক্ষাৎ পেয়েছে সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত, কোনো লক্ষণীয় চিহ্ন তা রেখে যায়নি। লাইকা উড়েছিল দ্বিতীয় স্পুৎনিকে, মহাজাগতিক রশ্মিতে সে স্নান সেরেছে বললেই হয়, কিন্তু ডাক্তাররা তার ফলাফল কিছু জানে না, পৃথিবীতে ফিরে আসেনি লাইকা। তা জানতে হলে যাত্রার পর ল্যাবরেটরিতে মহাকাশযাত্রীকে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তাই এই সুদূর অদৃশ্য শত্রুটা অজ্ঞাতই থেকে গেল।

মাটিতে ফিরিয়ে আনা দরকার নতুন লাইকাকে। কেউ জানত না কী তার নাম, কত জন যাত্রী থাকবে স্পুৎনিকে, কবে তা ছাড়া হবে। কিন্তু প্রতিটি সাফল্যেই এগিয়ে আসছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার শুভক্ষণ।

ইনস্টিটিউটের জানলার ওপাশে তখন ফুটে উঠছে রসালো গন্ধভরা পাতা, উড়ে আসছে পপলারের রোঁয়া; লাইম গাছের কুঁড়ি ভাঙার সময় এসে গেছে, মধুগন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস।

জুলাইয়ের এমনি এক দিনে গেট খুলে বেরল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ তার চেন বাঁধা পোষ্যদের নিয়ে, তার পেছু পেছু ভালিয়া এল একটা খাঁচা নিয়ে, তার ভেতরে ধূসর একটা খরগোস মনমরার মতো রোমন্থন করে চলেছে।

ফের একটা বিশেষ করে নির্দিষ্ট শাদাটে বিমান উড়ল আকাশে আর তার যাত্রীদের জন্যে মাঠের মধ্যে অপেক্ষা করে রইল সুঠাম ছাঁদের এক রুপোলী রকেট।

সেই একই রকম উঁচুতে উঠল বেপরোয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার, আরো সফলভাবেই নিষ্পন্ন হল যাত্রা: ব্রেক কষার ব্যবস্থাটা এবার আরো সাবলীল। ডাক্তাররা বললে যাত্রীদের প্রাণের ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে ভরসা করা চলে।

অভিজ্ঞ মহাকাশযাত্রীর মতো ব্যবহার করলে বেপরোয়া। ইঞ্জিন গর্জন করে উঠতেই ওর মনে পড়ে যেত অদৃশ্য চাপের কথা, তাই আগে থেকেই সে তার লম্বাটে মুখখানা নামিয়ে আনত থাবার ওপর, সবচেয়ে সুবিধাজনক ভঙ্গিতেই শুয়ে থাকত। ওপরে উঠে আগের মতোই খেলত রোদ্দুরের ছোপটার সঙ্গে, গবাক্ষ দিয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখত উজ্জ্বল সূর্যের দিকে; খানিক পরে আবিষ্কার করত যে অদৃশ্য বকসারটার ঘুসি কিছু নরম হয়ে এসেছে, তারপর মাটিতে নেমে আনন্দের নাচ নাচত, লজেন্স আর হালুয়া খেত, ফোটো তুলত আর জিব দেখাত ফোটোগ্রাফারকে।

রকেটে করে গিয়েছিল আরো দুটি কুকুর — তুষারিকা আর মানিক, আর শান্ত একটি খরগোস মারফুশকা। কুকুরদুটো অনেক অনভিজ্ঞ। এদের মধ্যে কেউ যখন নার্ভাস হয়ে পড়ত বা খিটিমিটি করত, তখন শৃঙ্খলা বজায় রাখত বেপরোয়া, গোঁ গোঁ করে আস্তে করে কান টেনে সমঝে দিত অন্য কুকুরদের। তারাও কথা শুনত তার।

'এত বুদ্ধি ওর হল কোথা থেকে?' ভালিয়াকে বলেছিল ইওলকিন, 'মানে মারফুশকা — এটা একটা নির্বিকার প্রাণী: সব সময় কেবল মুখ নেড়ে চিবোয়। এটির কান মলে দিলেও কোনো নালিশ শুনবেন না। কিন্তু ছোট্টো একটা কুকুরের মধ্যে এমন সাহস দেখে অবাক লাগে। তাছাড়া আর একটা জিনিস দেখেছেন, ভালিয়া, আমাদের খেঁকুরে এখন শুধু এক চমৎকার মহাকাশযাত্রীই নয়, খাঁটি দলপতি! প্রতিভা আছে বটে!'

'আস্তে,' বাধা দিলে ভালিয়া, 'আমার গুণী কর্মীকে নষ্ট করবেন না। যেই আপনার গলা শুনেছে অমনি মানিকের পেছনে লেগেছে। ও বেচারী এখনো কাঁপছে।'

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কিন্তু আরো বেশি করেই গলা চড়াল:

'হায়রে কুলিক, আসল নায়িকাকেই তুই পায়ে ঠেললি!..'

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কিন্তু জানত না যে সেই সকালেই মস্কোর সিনেমা হলগুলোতে ক্যামেরাম্যান কুলিকের নতুন ফিল্মের প্রদর্শন শুরু হয়েছিল আর পর্দা থেকে দর্শকদের দিকে তাকিয়েছিল গুবরের বিস্ময়কর মুখচ্ছবি। বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউটে ফোন করলে কে একজন বিদেশী:
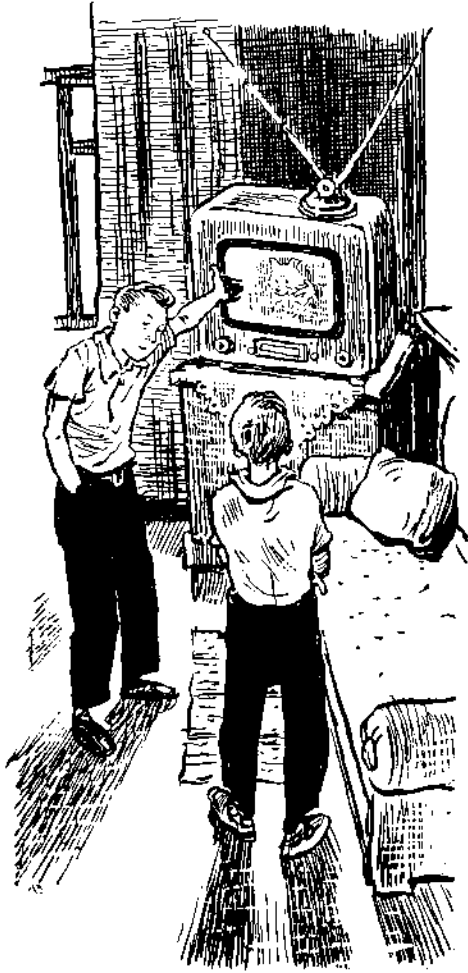
'আপনাদের ওখানে গুবরে নামে কেউ আছে? খবরের কাগজের জন্যে তার ফোটো নিতে চাই।'

'সানন্দে, আসুন না,' টেলিফোনে জবাব দিয়ে মনে মনে হাসলেন প্রফেসর, "গুবরেকে চিত্রতারকাদের দলেই ছেড়ে দিতে হবে।"

সেই, নাকি অন্য কেউ?

হুড়মুড় করে স্মেলভদের ফ্ল্যাটে গেনা ঢুকল একেবারে বিজয়ীর দর্পে।

'সুইচ, শিগগির সুইচ অন কর!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সে।

বরকা হতভম্বের মতো আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়ালে।

'আরে ওটা নয়রে হাঁদা, টেলিভিজন — তিয়াপাকে দেখাচ্ছে।'

"তিয়াপা, সেকী? কেন?" জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হয়েছিল বরকার, কিন্তু তার সময় ছিল না। ছুটে গেল সে 'স্টার্ট' মার্কা টেলিভিজনে, রেগুলেটর ঘোরাতে লাগল।

'আমরা এখন মহাজাগতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি কেবিনে,' কমেণ্টেটারের গলা শোনা গেল। ছবি তখনো ফোটেনি। স্ক্রীনে কেবল ছোটাছুটি করছে বিদ্যুৎ লাইনগুলো। হঠাৎ মিলিয়ে গেল লাইন। ফুটে উঠল শাদা ওভারঅল পরা লোকজনের ছবি। কেমন একটা কম্পমান যন্ত্রে বসে আছে প্যারাশুটিস্টের মতো পোষাক পরা একটি কুকুর। মুখটা তার লম্বাটে, তিয়াপার মতো।

'তিয়াপা না?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে গেনা।

সন্দেহভাবে মাথা নাড়ল বরকা। পালিশ করে আঁচড়ানো লম্বা লম্বা লোম কুকুরটার। তিয়াপার তুলনায় অনেক বেশি যেন শান্ত, অনেক আত্মপ্রত্যয়।

'বেপরোয়া ট্রেনিং নিচ্ছে,' ঘোষণা করলে সূত্রধর।

বরকা দৃঢ়ভাবেই বললে:

'নাঃ, তিয়াপা নয়।'

তারপর ফূর্তিবাজ একটা কুকুর দেখে হাসাহাসি করলে ওরা, লাফালাফি মুখভঙ্গি করছিল কুকুরটা, লোমশ মগের মতো কানদুটো নাড়াচ্ছিল হাস্যকরভাবে।

তারপর ফের দেখা দিল সেই আগেরটা, লম্বাটে মুখের কুকুরটা। রকেটের মধ্যে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে সে, তাকিয়ে দেখছে গবাক্ষে এসে পড়া রোদ্দুরের ছটা। মুখের ওপর তার এমন সরলবিশ্বাসী অসীম কৌতূহল যা কেবল তিয়াপার মুখেই সম্ভব।

'ওই বটে!' চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল বরকা, 'এক্ষুনি ইনস্টিটিউটে চল যাই।'

'ইনস্টিটিউটে?' জিজ্ঞেস করলে গেনা, 'গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে!'

'তবে কী করতে বলিস তুই? হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

'কিছু একটা ফন্দি বার করতে হবে। দাঁড়া ল্যুবকাকে ডাকি।'

জানলার নিচে গোলগাল যে বাধ্য বাচ্চাটা মাটি নিয়ে খেলছিল তাকে পাঠানো হল ল্যুবকার উদ্দেশ্যে। কৌতূহলী ল্যুবকার উদয় হতে বিলম্ব হল না।

'যা ভেবেছিলাম আমি, একেবারে যা ভেবেছিলাম!' হড়বড় করে বলতে বলতে ঘরে ঢুকল সে, 'রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কেবলি ভাবতাম কিছু একটা ঘটবে এইবার। দ্যাখ, ঘটল কী না!'

'বস,' চেয়ার দেখিয়ে কড়া গলায় বললে বরকা।

শান্ত হয়ে বসল ল্যুবকা।

'শোন, আজ থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। তোর ওপর ভার রইল ...'

এলোমেলো তিনটে মাথা ঝুঁকে পড়ল পাড়ার মানচিত্রের ওপর ...

ঘণ্টা খানেক বাদেই ল্যুবকার লাল সারাফান ঝলকে উঠল আঙিনায় আঙিনায়। ছুটে গেল গেটে, মিনিট খানেক পরেই ফের সেখান থেকে ছুটে গিয়ে বালতি হাতে একটা মেয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে তারপর ছুটল আরো দূরে।

ওর সঙ্গে দেখা হল ব্যাগ হাতে একটি বুড়ির। তার সঙ্গেও কী আলাপ করলে ল্যুবকা, এমন কি তার ব্যাগটা পর্যন্ত বয়ে দিলে গেট পর্যন্ত। বুড়ি অনেকক্ষণ ধরে বুঝতে পারলে না,

কী চাইছে ল্যুবকা, বোঝা যায় কানে একটু খাটো। তাহলেও যেটা জানবার সেটা জিজ্ঞেসাবাদ করে জেনে নিয়ে ল্যুবকা ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

একটা আঙিনায় বড়ো মতো কাঁধ চওড়া একটা ছেলে তাকে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু ল্যুবকা তাকে এমনি কী সব কথা বললে যে ছেলেটা হাত নাড়া বন্ধ করে উবু হয়ে বসে মাটির ওপর কী একটা প্ল্যান আঁকতে শুরু করে দিলে। তারপর দুজনে মিলে উঠোনে উঠোনে উঁকি মেরে প্রতিটি গেটে ঢুকতে লাগল আর ছেলেটা যে সব দরজার দিকে আঙুল দেখালে সেই সেই ঘরের লেটার বাক্সে একটি করে খাম গলিয়ে দিলে ল্যুবকা।

উঠোনে উঠোনে বেশ রাত পর্যন্ত দেখা গেল ল্যুবকার লাল সারাফানের ঝিলিক।

পোড়ো মাঠটার চারপাশের বাড়িগুলোর বহু ছেলেমেয়ে সেদিন এই চিঠিটি পেলে:

'চাঁদে প্রথম কে যাবে এই ব্যাপারটা যদি তোর কাছে জরুরী মনে হয়, যদি তুই বিজ্ঞান ও মহাকাশযাত্রীদের বন্ধু হোস, তাহলে কাল বেলা এগারোটার সময় গোলাপ বুলভারে আসিস তোর কুকুর সঙ্গে নিয়ে। তোর জন্যে অপেক্ষা করবে "ল্যুগেব" স্টাফের সভ্যরা।'

...গোলাপ বুলভার নাম কারণ প্রতিবছর এ রাস্তায় মাঝখানের পুষ্পসজ্জায় একটা গোলাপ ঝাড় বসানো হত। এগারোটা পর্যন্ত বরাবরের মতো, আগস্ট মাসের রোদ্দুরে ঝলমল করছিল বুলভারটা। প্যারাম্বুলেটরে শান্তভাবে নাক ডাকাচ্ছিল শিশুরা। ফুলগাছের মধ্যে বল ফেলার জন্যে দুষ্টুদের বকাবকি করছিল ধাইরা, বুড়িরা। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ঢুলছিল পেনশনভোগীরা। বহির্জগতের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে ডোমিনো খেলুড়েরা সজোরে চাল দিচ্ছিল গুটির।

হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো সবকিছু একেবারে বদলে গেল। জেগে উঠে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সব পেনশনভোগীরা, বাচ্চাদের বকুনি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল মুখরা ধাইদের, ডোমিনো খেলোয়াড়দের হাতের গুটি হাতেই রইল। বেঞ্চিগুলো যদি নড়তে পারত তাহলে তারাও ঘুরে দাঁড়াত ঐ অসাধারণ শোভাযাত্রাটার দিকে যেখানে হৈচৈ ঘেউ ঘেউ-য়ে ভরে দিয়েছে বুলভারের পথগুলো। রোদেপোড়া জনা বিশেক ছেলে মেয়ে সগর্বে টেনে আনছে চেনে বাঁধা সব দো-আঁশলা, এস্কিমো কুকুর, বকসার, ভেড়া-খেদানো কুকুর, এমন কি সরু সরু পাওয়ালা আদুরে সব পুডল কুকুর পর্যন্ত। সামনে চলেছে তিনজন: লাল সারাফান পরা একটি মেয়ে আর দুই বন্ধু। শুধু এই তিনজনেরই কোনো কুকুর নেই।

'সে কি, কোনো কুকুর প্রদর্শনী শুরু হয়েছে নাকি কোথাও?' জিজ্ঞেস করলে একটা বুড়ি।

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু জাজ? বিচার করবে কে?'

'বোঝাই যাচ্ছে, সামনের ঐ তিনজন।'

তাদের অনুমান নিতান্ত ভুল নয়। বোঝাই যায় 'ল্যুগেব'এর স্টাফ সদস্য — ল্যুবকা, গেনা, বরকার কীর্তি এটা। তারাই পাঠিয়েছিল রহস্যময় সার্কুলার। এক দিনের মধ্যে কুকুর মালিকদের সবার নাম ঠিকানা জোগাড় করে উঠতে পারা কম কথা নয় — তার জন্যে নিজের সমস্ত গুণপনা কাজে লাগাতে হয়েছে ল্যুবকাকে। আর দ্যাখো, সবাই এসে হাজির।

'ল্যুগেবের' পরিকল্পনাটা খুব সোজা: গোলাপ বুলভার থেকে ওরা সোজাসুজি গিয়ে হানা দেবে মহাজাগতিক ইনস্টিটিউটে। বলবে, "আমরা আপনাদের জন্যে কুকুর নিয়ে এসেছি। মহাকাশ জয়ের জন্যে

দরকার হলে এ সব আমরা আপনাদের দিয়ে দেব। কেবল দয়া করে তিয়াপাকে একবার দেখান।”

‘ল্যুগেবের’ মহৎ লক্ষ্যটা বরকা সমাবেশের লোকেদের খুব বিশদ করেই বুঝিয়ে বলেছিল, তবে তিয়াপার সম্বন্ধে একটি কথাও ভাঙেনি।

‘কুকুর দিয়ে দিতে রাজী আছ সবাই?’ জিজ্ঞেস করলে সে।

‘রাজী!’ সমস্বরে জবাব দিলে কুকুরমালিকেরা, আর সখেদে তাকিয়ে দেখলে নিজেদের দো-আঁশলা আর পুডলগুলোর দিকে। লেজ নাড়ছে কুকুরগুলো।

বরকা বললে, ‘বেশ, এবার আমরা সেরা কুকুরগুলোকে বাছব, মহাকাশে যাবে কিনা।’

পরিদর্শনের ব্যবস্থা হল এই রকম: সারি বেঁধে দাঁড় করাবার ভার নিলে গেনা, ল্যুবকা লিখতে লাগল কুকুরগুলোর নাম, আর তাদের পাশে পাশে বরকার রায় অনুসারে বসাতে লাগল যোগ কিংবা বিয়োগ চিহ্ন। ভাবী নামজাদাদের বরকা খুব কড়াভাবেই পরীক্ষা করলে। দেখা গেল প্রায় আধাআধি কুকুরেরই মহাজাগতিক নাম: শুক্র, মঙ্গল, প্লুটো, একের পর এক এই নাম। দুটো কুকুরের নাম রকেট, একটা আবার স্পুৎনিক। মোটের ওপর পরিদর্শনে খুশিই হল বরকা। কিন্তু লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া লোমওয়ালা স্কটল্যাণ্ডী টেরিয়ারটাকে দেখে ভুরু কোঁচকালে ও। মনে পড়ে গেল কুকুর প্রদর্শনীতে ছেলেগুলোর সেই গানটা: “কুকুর বেচারী গজিয়েছে দাড়ি।”

‘যত সব! এ কুকুর আমাদের চলবে না,’ কুকুরের মালিক হলদে ফ্রক পরা মেয়েটিকে বললে বরকা কড়া গলায়।

‘বললেই হল!’ কাঁদো কাঁদো গলায় বললে মেয়েটি, ‘আমার কুকুরটার লোম পালিশ করা নয় ঠিকই, কিন্তু খুব সাহস। দেখবে?’ ছোট্ট ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে দিলে সে।

সবাই ঘিরে দাঁড়াল বরকার চারপাশে। বরকা কাগজটা খুলে পড়ল:

“ওলিয়া জাৎসেপভার টেরিয়ার কুকুরটি অপরাধীকে আটকে ছিল বলে জেলা মিলিসিয়া আপিস ওলিয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

দপ্তর কর্তা: সলোভিওভ।”

সার্টিফিকেটটায় যথারীতি সীলমোহর দেওয়াও আছে।

‘কী নাম ওর?’ উবু হয়ে বসে ঝাঁকড়া চুলো আসামীটার গায়ে হাত বুলিয়ে সোহাগ করে জিজ্ঞেস করলে ল্যুবকা।

‘ওর নাম ভেরেনিসের চুল। ঐ নামে তারা আছে একটা। ছোটো করে ডাকি ভেরেন।’

‘ব্যাপারটা কী হয়েছিল শুনি,’ অনুরোধ করলে গেনা।

'ব্যাপার মানে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, দেখি একটা লোক ছুটতে ছুটতে কী একটা যেন লুকোচ্ছে তার বুকের মধ্যে। তার পেছু পেছু ছুটে আসছে একটা মেয়ে। ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে, "ধর ধর, আমার ম্যানিব্যাগ!" তাকিয়ে দেখি, আশেপাশে কোনো মিলিসিয়া নেই। বড়ো লোকও নেই কেউ। ভাবলাম কী করা যায়? চোর ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে। ভেরেনকে ছেড়ে দিয়ে বললাম — শি-ই-ই শি-ই-ই! বলতেই ভেরেন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার পায়ে। চেয়ে দেখি ফুটপাথের ওপর উলটে পড়েছে লোকটা। তার ওপর চেপে হাঁ করে আছে কুকুর — উঠবে কি, — আমার টেরিয়ারের দাঁত তো নয়, একেবারে ছুরি।'

গল্প বলে মেয়েটা নির্ভয়ে হাঁ করিয়ে দেখাল কুকুরটাকে। ঝকঝক করে উঠল এক সারি ছুঁচলো লম্বা লম্বা দাঁত।

'উরে বাস!' সশ্রদ্ধে কে যেন বললে।

'চলবে। তোর ভেরেনকেও নিলাম আমরা,' রাজী হল বরকা, 'চল যাই!'

মহাসমারোহে রাস্তা ধরে এগোল শোভাযাত্রা, পথচারীদের হতবুদ্ধি দৃষ্টি অনুসরণ করল তাদের। ট্রাম ড্রাইভাররা ট্রাম থামিয়ে পথ ছেড়ে দিলে এই লেজ নাড়ানো চতুষ্পদদের। লেমনেড ও আইসক্রীম স্টলের দোকানী মেয়েরা খদ্দেরদের কথা ভুলে ভেরেনের দাড়িমোচ দেখে বাহবা দিতে লাগল, ভেরেন কিন্তু একটু অপ্রস্তুত না হয়ে তার হলদে স্যাণ্ডালপরা মালিকটিকে টেনে নিয়ে চলল।

গোলাপ বুলভার থেকে ইনস্টিটিউট যাওয়ার পথে কম পরীক্ষা দিতে হয়নি এই বিজ্ঞান-বান্ধবদের। কৌতূহলী ছেলে ছোকরাদের হামলা আর খেঁকিয়ে আসা রাস্তার কুকুরদের তারা বীরের মতো সামাল দিলে। গরবী আত্মীয়দের সঙ্গে নির্মম লড়াই বাধাবার চেষ্টায় ছিল এরা। হঠাৎ কোণ থেকে ছুটে কোথাকার দুটো কুকুর তেড়ে এসেছিল ভেড়া-খেদানো কুকুরটার দিকে। ক্ষেপে গিয়ে এই প্রকাণ্ড

কুকুরটা জবাব দিতে ছাড়ল না, দাঁতে ছে'ড়া লোম উড়তে লাগল বাতাসে। তার ধারালো গ্রাস থেকে বোকা কুকুরদ্রটোকে উদ্ধার করতে হল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই যাত্রা সমাধা হল। সহচরদের একটিকেও না হারিয়ে শোভাযাত্রা এসে পে'ছিল লক্ষ্যস্থলে। গাছে ঢাকা অনতিবৃহৎ দোতালা বাড়িটায় তখন সবই শান্ত নিঝুম। গরমের জ্বালায় কুকুরগ্রলো সঙ্গে সঙ্গে শ্রয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

ঘ্রমটি থেকে বেরিয়ে এল ব্রড়ো দরোয়ান। অভ্যাগত দলটির দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলে:

'কাকে চাই?'

'ইনস্টিটিউটের যিনি সবচেয়ে বড়ো কর্তা, তাঁর কাছে এসেছি আমরা,' সকলের হয়ে জবাব দিলে গেনা।

উপহাসের হাসি হাসল দরোয়ান:

'ইস, কী আবদার। বাজে কাজে বৈজ্ঞানিক কমরেডদের সব তোদের কথায় কাজ থেকে টেনে আনি আর কি।'

'বাজে কাজে আসিনি আমরা। আমরা বিজ্ঞানের বন্ধ্র,' বোঝাবার চেষ্টা করলে বরকা।

'জানি তোদের বিজ্ঞান — রেলিং বেড়া টপকে বেড়ানো তো,' একটুও গলল না দরোয়ান।

'আপনি দাদ্র নিশ্চয় খবরের কাগজ পড়েননি,' বেশ ভারিক্কি গলায় বললে গেনা, 'অথচ মহাজাগতিক ইনস্টিটিউটের দরোয়ান আপনি।'

'উনি আমায় শেখাতে আসছেন!' চটে উঠল দরোয়ান, 'জানিস স্বয়ং প্রফেসর আমায় টুপি তুলে অভিবাদন করে। বলেছি ঢুকতে দেব না — বাস, এক কথা।'

'আর আমরাও যাব না, যাবই না!' বলে উঠল ছেলেগ্রলো।

গোলমাল শ্রনে উৎকণ্ঠিত চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে

এল একটা লোক। দ্বপক্ষের কথা শ্বনে সে ক্রুদ্ধ দরোয়ানকে বললে যে ব্যাপারটা তামাসা নয়। ওদের না তাড়িয়ে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত ছিল।

'আপনি যখন বলছেন,' ম্বখ হাঁড়ি করে বললে দরোয়ান।

'তাহলে দাও তোমাদের কুকুরগ্বলো,' খ্বশি হয়ে ওঠা ছেলেগ্বলোকে বললে ডাক্তার, ছোটো ছোটো বেজাতে দো-আঁশলাগ্বলোকে জড়ো করতে লাগল সে।

আঙ্বল দিয়ে দিয়ে দেখালে, 'এইটে, এইটে, এইটেও। আর টেরিয়ার — টেরিয়ার দিয়ে দিতে কষ্ট হবে না খ্বকি?'

'না, কষ্ট হবে না,' নিঃশ্বাস ফেললে ভেরেনের মালিক।

দান করা কুকুরগ্বলোকে নিয়ে যাওয়া হল।

'আর আমাদের কুকুরগ্বলোর কী হবে?' হতাশ হয়ে উঠল ভেড়া-খেদানো কুকুরটার মালিক।

'তোমাদের কুকুরগ্বলো অন্য কাজে লাগবে বেশি। যেমন, ওরা সীমান্তে পাহারা দেওয়ার কাজে চমৎকার। আমাদের কাজে, মানে, ওরা য্বৎসই নয়। যে সব কুকুরদের নেওয়া হল তাদের মালিকদের নাম এবার আমি টুকে নেব। তোমরা ওদের দেখতে আসতে পারবে, কুশল জেনে যাবে। প্রচুর ধন্যবাদ তোমাদের।'

বরকার ভয় হল ইনস্টিটিউটের কর্মীটি ব্বঝি এবার চলে যাবে, তিয়াপার কী হয়েছে তা জানা হবে না। ত্রস্তে সে ডাক্তারের হাত চেপে ধরল:

'একটু দাঁড়ান, আমার কুকুরটাকে একবারটি দেখান না।'

'তোর কুকুর? সেকি, সে কুকুর কি এই ইনস্টিটিউটে?'

'আমার একটা কুকুর ছিল — তিয়াপা। সেই বেপরোয়া। টেলিভিজনে দেখেই চিনতে পেরেছি।'

'কিন্তু বেপরোয়ার নাম ভাই আগে ছিল খে'কুরে, তিয়াপা তো নয়। তাছাড়া, ওটা ছিল রাস্তার কুকুর।'

'তাহলেও ও তিয়াপাই,' জেদ ধরল বরকা, 'যাচাই করে দেখতে পারেন। আমি ওর দিকে তাকিয়ে একবারটি শ্বধ্ব বলব: তিয়াপা আয় এদিকে! দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে তিয়াপা চলে আসবে আমার কাছে।'

ডাক্তারটি ভালো মান্বষ, বরকার মনঃকষ্ট সে ব্বঝল।

একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কিন্তু উপায় কী, হয়ত তোরই কুকুর, কিন্তু এখন তোকে কোনো সাহায্যই করা যাবে না। বেপরোয়া এখন শহরের বাইরে।'

'বাগান বাড়িতে?'

'ছুটি কাটাচ্ছে। আচ্ছা আসি।' বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

'একটু দাঁড়ান...' সামনে এগিয়ে গেল্ ল্যুবকা।

ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কী রে খুকি?'

'আপনাকে বলছিলাম কী জানেন, সারা বছর ধরে ও তিয়াপাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। আপনি ঠিক জানেন যে বেপরোয়ার নাম ছিল খে'কুরে?'

'ঠিক জানি। একথা এখানকার সবাই জানে।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করবার ছিল না। বরকা মাথা নিচু করে পায়ের চটি দিয়ে মাটির ওপর অর্ধবৃত্ত আঁকতে শুরু করলে।

'চল যাই,' আস্তে করে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে গেনা, 'ফের আসা যাবে এখানে।'

চাঁদে যাত্রা ও চন্দ্র প্রদক্ষিণ

ভাবী মহাকাশজয়ী, সপ্তম 'ক' শ্রেণীর ছাত্র গেনা কারাতভের পর্যবেক্ষণ-ডায়েরি থেকে

মানুষ চিরকাল পৃথিবীতে বাঁধা থাকবে না, সে ছুটে যাবে আলো ও শূন্যদেশ লক্ষ্য করে, প্রথমে ভেদ করে যাবে বায়ুমণ্ডলীর সীমা, তারপর জয় করবে সৌরমণ্ডলীয় সমস্ত মহাজগত।

ক. এ. ৎসিওলকভস্কি

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

আমি ঠিক ধরেছিলাম! ৎসিওলকভস্কিও অবশ্য ঠিকই বলেছিলেন। চাঁদে উড়ে গেল রকেট। জুল ভার্নের কথামত যারা ভেবেছিল কামান থেকে দাগা গোলার মধ্যে বারবিকেনের সঙ্গে উড়বে তারা, তাদের দেখে হাসি পায়। ইতিহাস প্রমাণ করে দিল।

পৃথিবী থেকে প্রথম চাঁদে যাওয়া, এটা কাল ঘটেছে আমাদের বাড়িতে, অবশ্য কোনো সাক্ষী ছিল না। এটার তোড়জোড় আমি করেছি সপ্তাহেরও বেশি দিন ধরে। ১২ই — ১৪ই সেপ্টেম্বর 'লুনিক-২' যে ভাবে গেছে আমাদের চন্দ্র যাত্রাতেও ঠিক সেই সব গতিরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছিল এই রকম: বরকা — বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কনটেনর আর পেনডেন্ট, আমি কম্যান্ড পোস্ট ও কম্পিউটর কেন্দ্র, ল্যুবকা — রেকর্ডার-স্টেনোগ্রাফার। আশ্চর্য, লোকে একই সময়ে কীভাবে রেকর্ড নিতে নিতেই ওরই মধ্যে আবার মহাকাশযাত্রার

ব্যাপারে নাক গলাতে আসে সেটা ও ভালোই দেখিয়ে দিয়েছে। ওর হিজিবিজি নোট থেকে পাকাপাকি সব হিসেব বার করা গেছে।

রকেটড্রোমে উদগ্র অপেক্ষায় নিথর হয়ে আছে রকেট। বোকা দর্শকেরা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাঁদ দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চাঁদ নেই আকাশে। বুঝিয়ে বলতে হল রকেট স্টার্ট নেবার সময় চাঁদ থাকবে চক্রবালে। তবেই রকেট চাঁদে গিয়ে পেঁছিবে ঠিক তখন যখন চাঁদ উঠে আসবে দিগন্তের ওপরে সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে। চাঁদে অবতরণ পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হবে।

শেষ মুহূর্তের তোড়জোড় সব চলল। বিশেষজ্ঞরা (আমি আর ল্যুবকা) কনটেনর (বরকা) স্টেরিলাইজ করে নিল: করিডরে বুরুশ দিয়ে ঝাড়া হল তাকে — কোনো রকম জীবাণু যাতে চাঁদে গিয়ে পেঁছিতে না পারে। পরে একটা ভুল করে বসা তো বিচিত্র নয়: অস্বাভাবিক একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে জীবাণু হয়ত একটা চান্দ্র হাতী হয়ে উঠতে পারে। পরে বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদে গিয়ে হয়ত সিদ্ধান্ত করবেন — বহুকাল আগে থেকে হাতী আছে চাঁদে...

হঠাৎ সিগন্যাল বেজে উঠল (এলার্ম ঘড়ির শব্দ)। আমরা ছুটে গেলাম রকেটে। তাহলেও স্টার্ট নিতে দেরি হয়ে গেল এক সেকেন্ড।

রকেটে চাপানো হয়েছে কনটেনর (বরকা ধপ করে গিয়ে বসল চেয়ারে), শোনা গেল বজ্রাঘাতের মতো বিস্ফোরণ (চেয়ারের পায়ের নিচে ফুটতে লাগল ফাঁকা পটকা),রকেটড্রোম ভরে গেল ধোঁয়ায়। যতটা ত্বরান্বয়ন দরকার তা পাওয়া গেল। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে উঠে গেল রকেট: ঝাড়ু দিয়ে চেয়ারে ঠেলা মারলাম আমি, সেটা যেতে লাগল অন্য ঘরে (ওই ঘরটা মহাজগত)।

'দ্বিতীয় মহাজাগতিক গতি টের পাচ্ছিস?' রেডিও যোগে আমি জিজ্ঞেস করলাম বরকাকে।

'না,' ও জবাব পাঠাল।

আরো জোর দিতে হল — আর একবার যথোপযুক্ত ধাক্কা দিলাম।

'এবার টের পাচ্ছি,' রাগ করেই বললে বরকা, কিন্তু লাফিয়ে উঠল না, কেননা ততক্ষণে মহাজাগতিক শূন্যে সে পেঁছে গেছে।

তাহলেও আর একবার জিজ্ঞেস করলাম। বরকা বললে, প্রতি সেকেন্ডে ও এবার ১১·২ কিলোমিটার করে এগুচ্ছে, মহামতি নিউটন যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক সেই রকম। কী শক্তি এই বিজ্ঞান! সতের শতকেই নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, শান্তভাবে হিসেব করে দিয়েছিলেন পৃথিবী ছেড়ে যেতে হলে কী পরিমাণ গতি দরকার — দ্বিতীয় মহাজাগতিক গতি। আর আমাদের কনটেনর এখন ঠিক সেই গতিতেই ছুটছে।

'চাঁদ আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করলাম বরকাকে।

কিন্তু ল্যবকা ব্যাঘাত ঘটাল, মুখস্থ করা সংবাদটা সে জানিয়ে দিলে:

'চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে যে কক্ষে আবর্তন করে সেটা অনেকটা গোলাকার। পৃথিবী থেকে তার সর্বাধিক দূরত্ব অথবা কক্ষপথের অপভূ হল ৪,০৬,৬৭০ কিলোমিটার, সর্বনিম্ন দূরত্ব বা অনুভূ ৩,৫৬,৪০০ কিলোমিটার।'

অবিচলিতভাবেই আমি জানালাম:

'কিন্তু আমরা চাঁদের দিকে যাচ্ছি সোজা রেখায় নয়, হাইপারবোলার রেখায়, বাঁকা পথে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটর যন্ত্র থেকে দেখছি আমাদের রকেটের পথ ৩,৭১,০০০ কিলোমিটার।'

'সবই বোঝা যাচ্ছে,' মহাজগত থেকে চেঁচিয়ে বললে বরকা, 'তার মানে আমাকে উড়তে হবে ৩,৭১,০০০ কিঃমিঃ: ১১·২ কিঃমিঃ/সেকেন্ড অথবা ৩,৭১,০০০ কিঃমিঃ ৪০,০০০ কিঃমিঃ/ঘণ্টা ...'

'মস্ত ভুল,' আমি বললাম, 'পৃথিবীর টান? সে কথা ভুলে গিয়েছিস? রকেটের গতি কেবলি কমছে!'

প্রমাণ করে দেবার জন্যে বরকার চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ধরে একটু পেছনে টানতে লাগলাম। তারপর আমার নোটগুলো নিয়ে অবাক হয়ে যাওয়া শ্রোতাদের দেখিয়ে দিলাম সঠিক গাণিতিক হিসেব কী জিনিস।

বললাম, 'ধর দশমিক দুই — আমাদের কালে এর তাৎপর্য কী বল দেখি। ধর, বরকা তোর গতি এখন ১১·২ কিলোমিটার নয় ১১ কিলোমিটার। তাহলে চাঁদে পেঁছবি? রকেটের ক্ষেপণ পথের হিসাব থেকে দেখা যায় গতিতে সেকেণ্ডে এক মিটার পরিমাণ ভুল হলেই রকেট তার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাবে ২৫০ কিলোমিটার। তার মানে সেকেণ্ডে ০·২ কিলোমিটার অর্থাৎ সেকেণ্ডে ২০০ মিটার ভুল মানে ২০০×২৫০ বা ৫০,০০০। ৫০,০০০ কিলোমিটার বিচ্যুতি! আর চাঁদের ব্যাসার্ধ তো মাত্র ১,৭০০ কিলোমিটার! সবাই জানে। তার মানে যতই করো চাঁদে গিয়ে আর পড়তে হবে না, পাশ কেটে বেরিয়ে যাবে! আরো একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, স্টার্টের সময় যে এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেছে তার ফলে ২০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়বে। অবিশ্যি আমাদের পক্ষে সেটা ভয়ানক কিছু নয়।'

'সাবাস ব্যাপার!' ল্যবকা বললে, আর বরকা চ্যাঁচাল যে চেয়ারে বসে থাকতে ওর ব্যাজার লাগছে: কনটেনর গিয়ে পেঁছন চাই চাঁদে, অথচ কোনো চাঁদই নেই।

আমি কিন্তু সবই আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলাম। জায়গা না ছেড়েই টান দিলাম একটা দড়িতে আর বরকার ডান দিকের দেয়ালে খুলে গেল চাঁদের একটা মানচিত্র: সাগরের

আঁকাবাঁকা তটরেখা একেবারে নিখুঁত করে আঁকা, গভীর সব ফাটলের বলি রেখায় ভরা চাঁদের গোল গোল গহ্বর, গোটা চাঁদটা — বিষণ্ণ, নির্জন, রহস্যময়।

আর মেঝের ওপর খড়ি দিয়ে আঁকা ছিল সাক্ষাতকারের বিন্দু, দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছনো ক্ষেপণ পথটা। দড়িতে ঝোলা চাঁদ আর বরকার চেয়ারটা সেই বিন্দুতে একই সময়ে এসে পৌঁছানোর কথা।

বরকা যে চেয়ারে বসেছিল সেটা ঠেলতে লাগলাম আমি, ও জানাতে লাগল উড্ডয়নের সময় আর খবরের কাগজের সঙ্গে তার গতির সময়টা মিলিয়ে দেখতে লাগল ল্যুবকা। "২১টা বেজেছে, ১২ই সেপ্টেম্বর," বরকা জানাল। আমি কম্যাণ্ড দিলাম, "কৃত্রিম ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্যে তৈরি হও!"

একটা প্লেটের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম-এ আগুন ধরিয়ে দিল বরকা। মহাজাগতিক শূন্যেদেশ আলোকিত করে অপরূপ ঝলক দেখা গেল। কৃত্রিম ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হওয়া গেল রকেটের গতিপথে ভুল হয়নি।

বরকার চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠতে থাকল চাঁদ আর পেছন দিকে পৃথিবী ছোটো হয়ে পরিণত হল একটা গোলকে। বরকা একেবারে গিয়ে পৌঁছেছে দেয়ালের কাছে, মানচিত্রটাও এসে পড়েছে বরকার কাছে... এইবার সেই রেখাটা, তাতে লেখা: "০০ ঘণ্টা ০২ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড, ১৪ই সেপ্টেম্বর, চাঁদে অবতরণ।"

বরকা লাফিয়ে উঠে পেস্টবোর্ড পেনডেণ্টটি ছুড়ে মারল চাঁদের উপরিভাগে। চাঁদের 'স্বচ্ছ' সাগরের এলাকায় অবতরণ নিষ্পন্ন হল পরিপূর্ণ

সাফল্যে, অবশ্য প্লেট ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটা না ধরলে। বরকা একদম ভুলে গিয়েছিল প্লেটটার কথা।

এখন আমি বুঝতে পারছি, কোনো রকম হিসাবপত্র না করে পোড়ো জমিটা থেকে লোহার টিউবকে রকেট করে যে ছেড়ে দিলাম, সেটা কী বোকামিই না হয়েছিল। অমন বিয়োগাত্মক পরিণতি তো তার হবেই। আমাদের যে অল্প ক্যালোরির জ্বালানি ছিল তা থেকে কি আর ক্ষেপণকে প্রথম মহাজাগতিক গতি দান করা যেত? ওটা হয়েছে একেবারেই গোমূর্খামি। এবার দেখলাম, সবচেয়ে আগে দরকার তত্ত্বগত প্রস্তুতি।

নভেম্বর, ১৯৫৯

আন্তর্গ্রহ স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্র ৭ই অক্টোবর চাঁদের অদৃশ্য দিকটার ফোটো তুলল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম। তার ওড়াটা ভালো করে বুঝে দেখলাম। 'পৃথিবীতে সর্বপ্রথম' একথাটা কতবারই যে লিখলাম, তবু বিরক্ত ধরছে না, বরং আগ্রহই বাড়ছে!

এবার 'লুনিক-৩' রকেট চাঁদ প্রদক্ষিণ করে ফিরে এল পৃথিবীতে। মোট সে উড়েছে ১০,০০,০০০ কিলোমিটার! ৬৫ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে লেন্সের ঢাকনি খোলা হয়েছে—তারপর 'রেডি! রেডি!' চল্লিশ মিনিট ধরে ফোটো তুলে গেছে জিনিসটা। ভারহীন অবস্থায় এটা একটা কাজের মতো কাজ!

রকেটের ভেতরে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে নিখুঁতভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে সে ফিল্মকে, ফিক্স করে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ সব কাজ চলেছে ১,৩০০ মিলিমিটার লম্বা একটা সিলিন্ডারের মধ্যে। আমি লম্বায় ১,৬২০ মিলিমিটার, তার মানে অতখানি জায়গায় আমিও ডেভেলপ করতে পারতাম নিশ্চয়, তবে অনেক খারাপ হত বৈকি। আমাদের বাথরুমটা লম্বায় ২,৫০০ মিলিমিটার। তাহলেও সেখানে ডেভেলপ করতে গিয়ে ফিল্ম আর শট প্রায়ই তো নষ্ট করে ফেলি।

চাঁদের অদৃশ্য দিকটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি বরকা আর ল্যুবকা তিনজনে মিলে যে ছবিটা তুলেছি সেটা অবশ্য মন্দ হয়নি। ফোটোগ্রাফির সমস্ত নিয়ম হুবহু মেনে ওটা করা হয়েছে, অটোমেটিক একস্‌পোজার লক টিপে আমরা ঠিকঠাক হয়ে বসি, ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করা হয়েছে একেবারে ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায়। চাঁদের নতুন মানচিত্রটা আমরা আঁকি একসঙ্গে মিলে। গহ্বরগুলো আঁকি আমি — ৎসিওলকভস্কি, জোলিও কুরি ও লমোনসভ জ্বালামুখ, আর সোভিয়েৎস্কি পর্বতমালা। মস্কো সাগর আর স্বপ্ন সাগর ল্যুবকা আঁকে সবুজ রঙে। আর মালভূমিগুলোকে বরকা আঁকে হলদে রঙ দিয়ে। বেশ ভালোরকমই খাটতে হয়েছে ওকে — চাঁদের এ পিঠে মালভূমি বেশি আর তথাকথিত সাগর কম। এ সাগর ধুলোয় ভরা, জল নেই। জুল ভার্নের কল্পন্যাসের মহাসাগর আর অসীম বন হল এই। আগে সে সব কথা বিশ্বাস করে বসেছিল কেবল বরকার মতো পটুয়ারা।

একবার একশ কি দুশ বছর আগে যদি এই মানচিত্রটা নিয়ে উদয় হতে পারতাম তাহলে কী হত ভেবে দ্যাখো?.. জ্যোতির্বিদরা ভেবে বসত আমি একেবারে চাঁদ থেকেই বুঝি নেমে এসেছি!

এপ্রিল, ১৯৬০

স্কুলে রেডিও-গেজেট খোলা হয়েছে। আমি বরকা আর লুবকার ওপর ভার পড়েছে ক্লাসের পক্ষে থেকে সংবাদ দেবার। কিন্তু ক্লাসের সংবাদ আবার কী হবে? আমরা ঠিক করলাম নতুন নতুন সমস্ত আবিষ্কারের কথা ব্রডকাস্ট করব মহাশূন্যে থেকে।

প্রায় মাস দুই কাটাতে হল পাড়ার লাইব্রেরিতে। বেশ জায়গা, প্রত্যেকেরই নিজের নিজের টেবল, তাতে ল্যাম্প। 'জ্ঞানই — শক্তি', 'কিশোর টেকনিক', সংবাদপত্র, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'প্রকৃতি', এ সব পড়লাম। বাবার কাছ থেকে এ বিষয়ের বিশেষ বইপত্তর নিয়েও পড়া গেল। ব্রডকাস্টের দিন ধার্য ছিল ২০শে এপ্রিল। আমরা তৈরি: ঐতিহাসিক কাহিনী, ডায়াগ্রাম, মানচিত্র — পুরো এক একটা একসারসাইজ খাতা ভরে ফেলেছি সবাই। শতকরা ৯৯ ভাগ কাজই রেডি। বাকি কেবল লিখে ফেলে রিহার্সাল দেওয়া।

হঠাৎ সব পন্ড হয়ে গেল।

ঘরে আমরা তিনজন জুটে রিপোর্ট লেখার বদলে কী স্টাইল হবে সেই নিয়ে তর্ক শুরু করে দিলাম। পরে মিটিয়ে নেওয়া গেল। কিন্তু লুবকা ফের আবার বাতাস সম্বন্ধে তার লেখা একটা কবিতা জোরে জোরে আবৃত্তি করতে শুরু করলে। আমি ওকে বললাম, আমাদের মনিটর ল্যেভকা পমেরান্‌চিকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই তার উচিত। চোঁতা কাগজ দেবার সময় আবেগ ভরে নিজের কবিতাও সে দিয়ে দেয়। লুবকা কেঁদেই ফেলল। বরকা তখন টেবল চাপড়ে বললে, প্রকৃতির খুব রঙীন বর্ণনা করা চাই, নাইটিঙ্গেল, রামধনু ইত্যাদি সব দরকার। আমার সহ্য হল না। চাঁটি মারলাম ওকে। ও মারলে আমাকে। কোনো কথা না বলেই মারামারি চলল আমাদের — কেননা কথা বললে লোকের দৃষ্টি পড়বে সে দিকে। যখন আবার মিটমাট হল, ততক্ষণে বাবা এসে ভাগিয়ে দিলে আমাদের সবাইকে।

ভয়ানক মন খারাপ, একলা একলা বসে এই সব লিখছি। এখন কী উপায় হবে আমাদের?..

এইখানেই ডায়েরির সূত্র ছিন্ন হয়েছে...

স্পুৎনিক বলছি...

সারা রাত গেনা কেবল এপাশ ওপাশ করলে। মনশ্চক্ষে দেখতে পেলে মনিটর পমেরানচিক ক্ষেপে গিয়ে ওকে বলছে, "তৈরি হতে পারিসনি তো? আগেই জানতাম! মহাজগতের ব্যাপারে তাহলে নতুন কাউকে ভার দিতে হয়! তোর ওপর বরং পরিষ্কার পরিচ্ছনতা

দেখার ভার দেওয়াই ভালো। এই নে তোর স্যানিটারি ব্যান্ডেজ।” “কী লজ্জা!” আতঙ্ক হল গেনার।

ভোরের আলো ফুটতেই না ফুটতেই ও খালি পায়ে ছুটল তার পড়ার টেবলে; গিয়েই একেবারে থ' হয়ে গেল: টেবলের ওপর পড়ে আছে তৈরি প্রবন্ধ! একেবারে মার্জিন রেখে টাইপ করা, কোণে পিন দিয়ে গাঁথা। প্রবন্ধের নাম ‘স্পুৎনিক বলছি’।

বুঝতে দেরি হল না গেনার। হেসে ছুটে এল সোফার কাছে, যেখানে ঘুমচ্ছে তার বাবা। পায়ের ওপর নড়ে চড়ে হাসি মুখে বললে:

‘ছাত্রদের কাজ তাদের বাপেদের করে দেওয়া উচিত নয়।’

আনাতোলি ইয়েভগেনিয়েভিচ একটা চোখ খুলে ঘুম ঘুম গলায় বললে:

‘কেন? এতো তোদেরই সব করা। আমি শুধু তোদের ভাবনাটা লিখে দিয়েছি। তাছাড়া আমি কবিতা লিখতে পারি না, জানিস। কিন্তু বাতাস সম্বন্ধে ঐ কবিতাটা কে লিখেছে, চমৎকার। যা পালা!’

বলেই ঘুমিয়ে পড়ল, আর গেনা ছুটল একেবারে বাতাসের মতো।

ঠিক সেই মুহূর্তে সে ক্লাসে ঢুকল যখন লালচে মুটকো পমেরানচিক বকুনি দিচ্ছিল ল্যুবকা আর বরকাকে।

‘ছি ছি যত বড়াই!’ মনিটর বলছিল তাদের, ‘একটা দায়িত্বও পূরণ করতে পারিস না। পাইওনিয়র পরিষদে আমি এ কথা তুলব কিন্তু।’

‘এ্যঃ পমেরানচিক!’ চেঁচিয়ে বললে গেনা, খুশিতে নাকের কাছে তুড়ি দিলে মনিটরের, ‘এই দ্যাখ! তৈরি!’

‘হুররে!’ যুগপৎ চেঁচিয়ে উঠল বরকা আর ল্যুবকা; হতভম্ব মনিটরকে ফেলে রেখে গেনার পেছু পেছু তারা ছুটে গেল বারান্দায়।

‘বুঝেছিস,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে গেনা, ‘সকালে উঠে ভাবছি, গেছি এবার, পমেরানচিক খুব একচোট নেবে, দেয়ালপত্রিকাতেও ছবি বার করে দেবে হয়ত। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি টেবলের ওপর প্রবন্ধ...’

টিফিনের সময় বন্ধুদল গিয়ে হাজির হল রেডিও কর্নারে। দরজায় অনেকখন ধাক্কা দিতে হল: উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল দরজা, ব্রডকাস্টে কেউ যেন এসে গোলমাল না করে। কিন্তু যেই শুনল মহাজগতের ব্যাপার, অমনি দরজা খুলে দিলে। বসালে টেবলের ধারে। ল্যুবকার নাকের সামনে একটা ঘড়ি রেখে বললে, “নজর রাখ, তোদের সময় দেওয়া হয়েছে ১৫ মিনিট।” চুপচাপ মাথা নেড়ে ল্যুবকা তার অবাক চোখদুটো মেলে রাখল ঘড়ির ডায়েলে।

'কে শুরু করবে?' জিজ্ঞেস করল ডিউটিম্যান।

গেনার দিকে দেখালে বরিস, 'ও শুরু করবে প্রথমে, তারপর আমরা, পালা করে।'

ডিউটিম্যান মাইক্রোফোন চালু করলে, শুরু হল ব্রডকাস্টিং। উত্তেজনায় বাধো বাধো গলায় পড়তে শুরু করলে গেনা:

স্পুৎনিক বলছি!
স্পুৎনিক বলছি!
পৃথিবীর
তৃতীয় সোভিয়েত স্পুৎনিক
বলছি!

শুনুন, শুনুন! আপনাদের আমি শোনাব পৃথিবী, আকাশ, তারার কথা। সৌভাগ্যবানেরা শুনুন! এ গ্রহের অনেক রহস্যের কথা স্কুলছাত্রদের সমস্ত পুরুষদের মধ্যে আপনারাই প্রথম শুনছেন।

সূর্যকে জানেন তো? জানেন বৈকি, রোজই তো সে আলো দেয়!

প্রাচীন কালে সূর্যকে পূজো করত মিশরীয়রা। উত্তপ্ত 'রা' দেবতার ক্রোধের ভয়ে তারা কাঁপত — তাদের ঘিরে আছে যে মরুভূমি। সূর্যের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারত কেবল একজন — মিশরের রাজা ফেরাও, খুব দুর্লভ, বহুমূল্য, কালো কাচের এক চশমা ছিল তার। কিন্তু এ ফেরাও পর্যন্ত কখনো সন্দেহ করেনি যে 'রা' দেবতার ভয়ঙ্কর কিরণ থেকে, সূর্যের অতি বদান্যতা থেকে যে বাঁচা গেল সেটা প্রার্থনার জন্যে নয়, চশমার জোরেও নয়, নীল আকাশের জন্যে — বায়ুমণ্ডলের জন্যে। তবে আপনারা নিশ্চয় এ সবই জানেন, জানেন সূর্যদেবতার কথা, প্রাচীন গ্রীকদের কথা, যারা অ্যাট্‌মস্ফিয়ার —
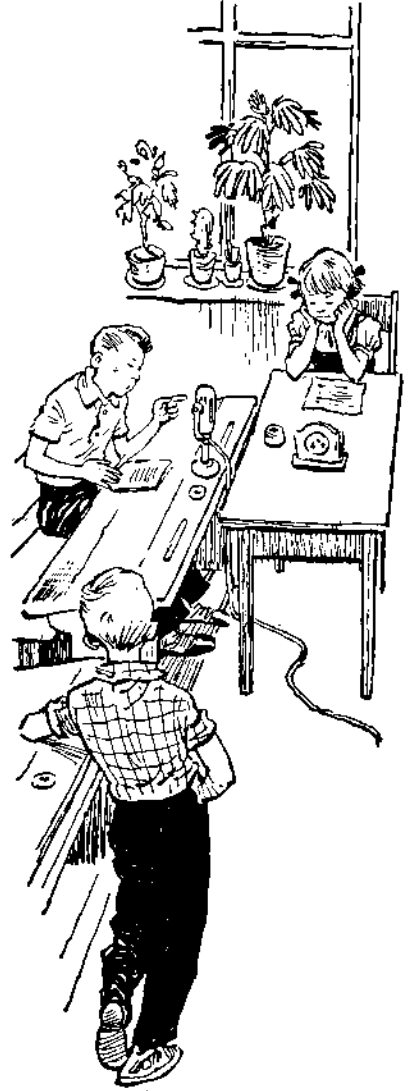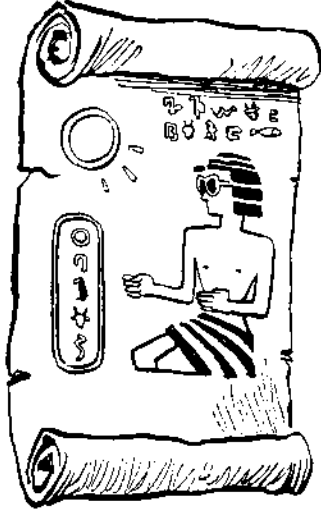
এই নাম দেয় বায়ুমণ্ডলীর, জানেন যে এ বায়ুমণ্ডল আমাদের পৃথিবীর রক্ষক ...

যে বছর আমি আকাশে উঠি সে বছর বায়ুমণ্ডল অশান্ত হয়ে উঠেছিল। গোল টেবলের চারপাশে বসেছিলেন বৈজ্ঞানিকেরা এ বায়ুমণ্ডলের আচরণ আলোচনা করার জন্যে।

একজন বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ, অবস্থা শঙ্কাজনক। গোটা পৃথিবীর ওপর দুর্দান্ত ঝোড়ো আবহাওয়ার রাজত্ব। লোকেদের ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ নামছে। তথ্য দিই: ১৯৫৬ সালে ভূগোলোকে একশটি বড়ো বড়ো দুর্যোগ ঘটেছে বারো মাসে। ভারতবর্ষে বন্যায় হাজার হাজার গ্রাম ভেসেছে, ক্ষেত ডুবেছে, আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ লোক। বৃষ্টিতে, হঠাৎ ফুঁসে উঠা নদীর জলে ইরান আফগানিস্তানের মতো শুকনো দেশও ডুবেছে। আর পশ্চিম ইউরোপে হঠাৎ নেমেছে ভয়ঙ্কর ঠান্ডা, হাজার হাজার লোক মরেছে তাতে।'

বিপর্যয়ের তালিকা পড়ে যেতে থাকেন দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক:

'১৯৫৭ সালে আরো বেড়ে ওঠে বিপর্যয়। গুজব ছড়ায় যে পৃথিবীর কী একটা যেন হয়েছে, দুর্বোধ্য পরিবর্তন ঘটছে আবহাওয়ার। ফেব্রুয়ারি মাসেই মস্কোয় শুরু হয়ে গেল বসন্ত, অথচ গরমের দেশ তাশখন্দ, আল্‌মা-আতায় বরফ পড়ল প্রচুর। কৃষ্ণ সাগরের ওপর ফুঁসে উঠল বিপুল তুফান, তারপর তুষার ঝঞ্ঝা। আর ঠিক সেই সময় গরমে মরছিল অস্ট্রেলিয়া আর উরুগুয়ে, আগুন ধরে যাচ্ছিল বনে আর শুকনো মাঠে ...'

বক্তৃতা দিলেন তৃতীয় জন:

'পরের বছরের কথা বলি। সিংহলে বন্যা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ঘোর তুষারপাত। মস্কোয় মে মাসের গরম শেষ হল ভয়ঙ্কর বজ্রপাত আর অগ্নিকাণ্ডে। জাপানে একেবারেই অনাবৃষ্টি -- জলের রেশন শুরু হল।'

শেষের জন বললেন সূর্যের কথা:

'কমরেড, এ হল সূর্যে তুমুল সক্রিয়তার একটা পর্ব। তপ্ত ভাস্কর ফুঁসছে। মহা মহা বিস্ফোরণে শূন্যদেশে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে সৌর গ্যাস -- দশ লক্ষ সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তা উত্তপ্ত।

এই সব তেজকণিকার নাম আপনারা জানেন — কর্পাসকল্‌। এই কণিকারা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে সেকেন্ডে হাজার কিলোমিটার বেগে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করছে তারা। সূর্যের এই বিস্ফোরণ দেখা যায় প্রতি একাদশ বৎসরে। অল্পদিন আগেও তাই ঘটেছিল।

'প্রাকৃতিক বিপর্যয় আগেও ঘটেছে পৃথিবীতে। কিন্তু টেলিগ্রাফ, রেডিও, বিমান — এ সব যখন ছিল না, তখন লোকে জানতে পারত না কী হচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। সমস্ত দুর্যোগের হিসাব নেবার জন্যে সমবেত হয়েছি আমরা এই প্রথম, আসামীকে ধরব আমরা। অভিযোগ সূর্যেরই বিরুদ্ধে। আমাদের মতে এ সূর্য বাতাসে বিপুল সব স্রোতের উপর প্রভাব ফেলছে, তা থেকে জাগছে ঝড় ঝাঞ্ঝা, তাপ আর শৈত্য। আমাদের অভিযোগ যাচাই করা যাবে স্পুৎনিকে...'

আমি যখন উড়ি, তখন এই কথা বলেছিলেন পণ্ডিত। আর আমি স্পুৎনিক যা দেখলাম তা এই:

সূর্য থেকে উঠল সৌর বায়ুর এক স্তম্ভ। ছুটল পুড়তে পুড়তে, বেগে। নির্ভয়ে গাইতে লাগল এই গানটা:

এই! সাবধান!
　　　　পথ ছাড়ো
মহাজগতের ধূলি!
সবকিছু তছনছ করে যাবো পথে
আমি — তারকার ছেলে মহাবীর!
পৃথিবী,
　　　　আমাদের তারকার সোপানে
একটা নির্বোধ গোলক তুই!
উড়ছি, উড়ছি, উড়ছি,
উড়ে চলেছি তোর কাছে!
দগ্ধ করব তোকে,
　　　　বন্যায় ডোবাব,
জাগিয়ে তুলব ঝড় ঝঞ্ঝা,
পরোয়া করি না তোর
কোনো পার্থিব লাঞ্ছনা!
উড়ছি, উড়ছি, উড়ে আসছি,
বিশ্বের সবার চেয়ে দ্রুত।

আমি সৌর,

আমি আগ্নেয়

সবচেয়ে করাল বায়ু আমি।

আমি স্পুৎনিক, ভয় হল আমার। বায়ুমণ্ডল যদি আত্মসমর্পণ করে বসে? রুখে দাঁড়াতে না পারে? তাহলে সূর্যের এ তপ্ত নিঃশ্বাসে পৃথিবীর জীবন্ত সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ...

কিন্তু পৃথিবী, আমাদের গোলগাল শক্তসমর্থ এই যে গ্রহটি মহাব্যোমে সাড়ে চার মিলিয়ার্দ বছর ইতিমধ্যেই কাটিয়েছে, কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে, সে তার জোর দেখিয়ে দিলে অহঙ্কারীকে। সৌর বায়ুর পথে সে বসিয়ে দিলে অদৃশ্য এক ফাঁদ, আর এই চৌম্বিক ফাঁদে ধরা পড়ে গেল বিপজ্জনক আগন্তুক। দ্রুতগতি কর্পাস্‌ক্‌লরা এবার বন্দী!

অদৃশ্য বিপজ্জনক সব কণিকার দুটি মহাচক্র ঘেরাও করেছিল পৃথিবীকে। চক্রের ভেতর চক্র, তার মাঝখানে আমাদের পৃথিবী। বড়ো চক্রটা আমার মাথার ওপর, একেবারে মহাবিশ্বের চৌকাঠে; ছোটো চক্রটার মধ্যে বার বার উড়ছি আমি। খুব একটা আনন্দ হচ্ছিল না তা বোঝাই যায়। রেডিও অ্যাকটিভ ক্ষতিকর বিকিরণের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে কারই বা সাধ যায়?

আমার অবশ্য লোহার হার্ট, কিন্তু আমার পরে মহাজগতে আসবে মানুষ, তাদের হার্ট জীবন্ত। তাদের পক্ষে এ কিরণ বেশি মারাত্মক। ওদের জন্যে পথ সন্ধানের দায়টা আমার।

দুটি গোছা বিকিরণ পরীক্ষা করে দেখলাম আমি — আমার ছোটো ভাই স্পুৎনিকেরা আবিষ্কার করেছিল এদের। পরীক্ষা করে দেখলাম বেশ মন দিয়ে, শান্তভাবে। নিজেকে মনে হচ্ছিল ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক। পর্যবেক্ষণ করে টেপ রেকর্ড নিয়ে ব্রডকাস্ট করে পাঠালাম। জানতাম, শত শত কেন্দ্র থেকে আমার এ সংকেত ধরা হবে, পৃথিবীর যেখান থেকেই সে সংকেত পাঠাই না কেন। এদের কেউ বিশেষজ্ঞ, কেউ অ্যামেচার। আমার পাঠানো কাহিনী লোকে কাগজে লিখে খামে পুরে পাঠাল 'মস্কো, কসমস' এই ঠিকানায়। নয়ত টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনে বসে টরে টক্‌কা করেছে ঐ একই ঠিকানায় — 'মস্কো, কসমস'।

আমি সাবধান করে দিলাম, 'মহাজাগতিক রশ্মি বিপজ্জনক। অদৃশ্য এই গুলিবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা কোরো মহাকাশযাত্রীরা। এর
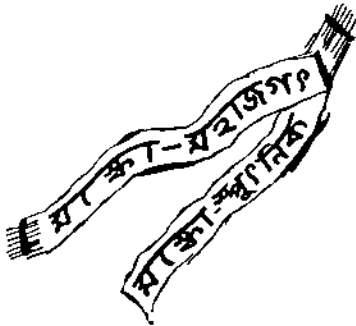
প্রতিটি কণিকায় ধ্বংস হবে দেহের ১৫ হাজার কোষ। অবশ্য সেটা খুব ভয়ানক নয় কেননা লোকের দেহের কোষের সংখ্যা হাজার হাজার কোটি। তাহলেও এ শত্রু থেকে সাবধান মহাকাশযাত্রী। আত্মরক্ষার উপায় খোঁজো! দুর্ভেদ্য কেবিন উদ্ভাবন করো! বিপজ্জনক ঐ চক্রে যেও না!..'

দুই চক্রের মাঝখানে ধেয়ে বেড়াতে লাগল মহাজাগতিক কণিকারা, কিন্তু পালাতে পারল না। চৌম্বক ফাঁদ ওদের শক্ত করে আটকে রেখেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতি, সবচেয়ে প্রবল কিরণগুলো কিন্তু ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বায়ুমণ্ডলে, তাকে তপ্ত করে তুলে ভয়ানক আলোড়ন জাগাল পৃথিবীতে। ফের কানে এল বৈজ্ঞানিকের কড়া কণ্ঠস্বর:

'বিপর্যয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ কমেছে। কিন্তু গত বছরে, ১৯৫৯ সালে এ বিপর্যয় সবচেয়ে বিয়োগাত্মক। অনাবৃষ্টির দরুন ব্রেজিলে লক্ষ লক্ষ লোকে দুর্ভোগ সয়েছে। পাঁচ পাঁচটা গ্রীষ্মমণ্ডলীর সাইক্লোন ও বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে মাদাগাস্কার দ্বীপ। জাপানে শুরু হয় টাইফুন, মেক্সিকোয় ঝড়, ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদ্রতটে তুফান — এই হল এ বছরের সমাপ্তি।'

নিচে লোকে স্পুৎনিকের কথা শোনার জন্যে উদগ্রীব, আমি তাই কাজ করেই চললাম, কাজের পর কাজ, আমার সঙ্কেতগুলোকে বৈজ্ঞানিকেরা পরিণত করবেন অঙ্কের ভাষায়, চোখের পলকে হিসেব বার করার যন্ত্রে তা পাঠাবেন সমাধানের জন্যে, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করবেন মহাব্যোমের রহস্য ভেদ করতে।

আমি মহাজাগতিক ল্যাবরেটরি — মানুষের পথ সন্ধান করেছি আমি। লোকে যখন মহাকাশে লাফ মারার আয়োজন করছে, সেই সময়ে যে আমি বেঁচে ছিলাম তার জন্যে আমি খুশি। ব্যোমযান তৈরি করেছে মানুষ, রকেট পাঠিয়েছে মহাজগতের নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে, — চাঁদে, আর নীল সবুজ রহস্যময় সব গ্রহ সমেত দূর তারকায় যাত্রার স্বপ্ন সে দেখছে তখনি, স্বপ্ন দেখছে আলোর গতির মতো গতি অর্জন করবে, দশলক্ষ মিলিয়ার্দ কিলোমিটার পাড়ি দেবে বছরে, স্বপ্ন দেখছে মহাপরাক্রান্ত জ্বালানি তৈরি করবে, যাতে এ গতি পাওয়া যাবে। শক্তিমান হয়ে উঠতে চেয়েছিল মানুষ, বিশ্বাস রেখেছে মহাকাশে গিয়ে সে হয়ে উঠবে মহান। তখন সে পৃথিবীর চারপাশে ওড়াবে মস্ত মস্ত স্পুৎনিক — মহাকাশযাত্রার অন্তর্বর্তী স্টেশন, চাঁদে তৈরি করবে রকেটড্রোম, সেখান থেকে যাত্রা করা হবে অন্যান্য সব বিশ্বে। আর অতি দূর দূরান্ত সব লোকে, অজানা সব তারকার গ্রহ উপগ্রহে, তেজ আহরণ করবে সেখানকার সূর্য থেকে, তারপর যে মাটি তাকে পাখা দিয়েছে ফিরে আসবে সেই পৃথিবীতে।

এ হবেই — এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গোটা মহাব্যোমের উপকূল হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবী...

সেই দিন এগিয়ে আসছে যেদিন আমাকে পুড়ে যেতে হবে: প্রতিটি প্রদক্ষিণের সঙ্গে

সঙ্গে আমি একটু করে নামছি মাটির দিকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা যে মেয়াদ ধার্য করেছিলেন সে মেয়াদ পেরিয়ে গেল, আর আমি কিন্তু এখনো উড়ছি, টের পাচ্ছি স্বাধীনতার লঘুতা।

'সে কী?' অবাক হলেন বৈজ্ঞানিকেরা। 'আমাদের ইলেক্‌ট্রোন যন্ত্রে এমন সুখকর একটা ভুল হওয়া সম্ভব কি?'

না, ইলেক্‌ট্রোন যন্ত্রে ভুল হয়নি! যে অংক তাদের দেওয়া হয়েছিল সেটা তারা সঠিকভাবেই কষে দিয়েছে। তবে আর একটা অবাক কাণ্ড ভাগ্যে ছিল বৈজ্ঞানিকদের। এটা ঘটালে আমার জ্যেষ্ঠ ভাই 'লুনিকেরা'।

আমি যে উঁচুতে উঠতে পারিনি সেই উঁচু থেকে এই রকেটগুলো তাকিয়ে দেখেছে পৃথিবীর দিকে; দেখেছে যে পৃথিবী নিঃশ্বাস নেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নেয়! আমি যখন স্টার্ট নিই তখন সূর্যের কিরণে বায়ুমণ্ডল জ্বলে যায় আর ফেঁপে ওঠে তা। যেন নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ফুলে উঠল পৃথিবীর। আর আমি যখন কাজ করে চলেছি, ততক্ষণ বায়ুর মেঘ ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নেমে এসেছে — নিঃশ্বাস ফেলায় যে রকম ছোটো হয়ে আসে মানুষের বুক। আমার ওড়ার পথটা ছিল তার পেছু পেছু তাই বেঁচে যাই আমি! আরো পুরো একবছরের কাজ জুটল আমার।

সর্বকালের স্কুলছাত্রদের মধ্যে সৌভাগ্যবানেরা, জেনে রাখুন যে পৃথিবীর মাথায় একটা মুকুট পরানো আছে! বিশ্বের সমস্ত মুকুটের চেয়ে সুন্দর আর মহার্ঘ এই মুকুট — জীবনের বায়বীয় মুকুট। এ মুকুটের আয়তন এতদিন ছিল রহস্য — আজ আমি তা উদ্ঘাটন করেছি: ২০ হাজার কিলোমিটার উঁচু। এটা নেহাৎ চাট্টিখানি কথা নয়। মুকুটের বনিয়াদটা আপনাদের অবশ্য জানা — বাতাস। আমি যতটা উঁচুতে উঠেছিলাম সেখান থেকে পাকা জহুরীর মতো তার একটা মণি খসিয়ে দেখেছি, সেখানে কেবল হাইড্রোজেন। মুকুটের মধ্যে সবচেয়ে হালকা গ্যাসের রাজত্ব। এ গ্যাস এল কোথা থেকে? সূর্যের কিরণে তা সৃষ্টি হয় জল থেকে। পরমাণুর পর পরমাণু হাইড্রোজেন শেষহীন হাওয়াই বেলুনের মতো উড়তে উড়তে উঠে যায় হাজার হাজার কিলোমিটার উঁচুতে, হালকা স্বচ্ছ একটা মুকুট গড়ে তোলে পৃথিবীর ওপরে। আর এ গ্যাস যেখানে নেই, সে জায়গা থেকেই শুরু হয়েছে মহাকাশ, আন্তর্নাক্ষত্রিক ব্যোমদেশ।

সৌভাগ্যবান আপনারা, এবার বুঝতে পারছেন তো কী অদৃশ্য টুপির নিচে আপনাদের বাস? অনুভব করতে পারছেন কি মহাব্যোমের মধ্যে আপনার অবস্থানটা কোথায়?

এবার বন্ধুগণ, শেষ করতে হবে আমার ভাষণ, দশ হাজারবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যা দেখেছি তার স্মৃতি। পথটা আমার দীর্ঘই বটে, এখান থেকে মঙ্গলগ্রহ যতটা তার আট গুণ, অথবা শুক্র গ্রহ যতটা তার এগার গুণ। রেডিওয় আমার কথা পেঁছচ্ছে আপনাদের কাছে।

আর কয়েকদিন বাদেই আমি বায়ুমণ্ডলীর ঘনস্তরে নেমে আসব, এঁকে যাব আমার শেষ বাঁক। এতে আমার মোটেই দুঃখ নেই। আমি জানি, শিগগিরই রূপোলী ব্যোমযান মহাকাশ ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। মহাকাশযাত্রীরা তখন আমার কথা মনে করবেন, আর যেসব সাহসী, বুদ্ধিমান মানুষ আমায় গড়েছেন তাদের জানাবেন অজস্র ধন্যবাদ।

বিদায়! স্পুৎনিকের কথা ফুরুল, স্পুৎনিকের কথা শুনলেন...'

লুব্বকার পড়া যখন শেষ হল (ওকে দেওয়া হয়েছিল শেষ পাতাগুলো) তখন তার মনে হল মুখের মধ্যে জিভটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ইঙ্গিত করে জানালে, জল খেতে চায় সে।

ডিউটিম্যান তাকে এক গ্লাস জল দিয়ে বললে:

'বক্তৃতা চলেছে কিন্তু ৪৫ মিনিট ধরে।'

'তাই নাকি! আর আমাদের ক্লাস? বন্ধ মাইক্রোফোনের সামনে এতক্ষণ বলছিলাম নাকি?'

সশঙ্কে ছুটে গিয়ে দরজা খুললে গেনা। হাঁপ ছেড়ে দেখলে, ক্লাসের সব ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, যেন টিফিনই চলছে। তার মানে শুনছিল সবাই!

অষ্টম শ্রেণীর একটা টেরি-কাটা ছাত্র ছুটে এল বরকার কাছে। বললে:

'এতক্ষণ ধরে এসব তোরা বকছিল নাকি? বাহাদুরি বটে! আমাদের জ্যামিতির পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। মোট কথা মহাজগত আর কী? উড়তে পারলে তবে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে এসে দাঁড়ালেন জ্যামিতির শিক্ষিকা।

'জ্যামিতি নইলে কিন্তু সুখভ, কোনো মহাজগতেই তুই পেঁছবি না।'

কড়া গলায় বলে চলে গেলেন রাগ করে। আর ওদিকে গেনাকে ততক্ষণে চেপে ধরেছে পমেরানচিক:

'বাতাস সম্পর্কে খাসা বলেছিস বটে! আমিও কিন্তু বাতাস নিয়ে খানিকটা লিখেছিলাম। তার শুরুটা, দাঁড়া,' কয়েকটা টোকা সে মারল নিজের কপালে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে:

বাতাস তুই কতো শক্তিধর,
মেঘের সাথে খেলিস,
বাজের আগে চলিস
শনশনিয়ে ঘরবাড়ির উপর।'

'হাঁদারাম!' গেনা একেবারে বসিয়ে দিল ওকে। 'আমাদের এ বাতাস একেবারে অন্য জিনিস — মহাজাগতিক বাতাস। কিছুই মাথায় ঢোকেনি তোর। কী আমার কবি! এক লাইন কবি পুশকিনের, এক লাইন নিজের। জুড়ে দিয়ে একেবারে পুশকিন-পমেরানচিক।'

এমন তুলনা সহ্য হল না পমেরানচিকের। সে যে ক্লাসের মনিটর, শৃঙ্খলা রক্ষার দায় তার ওপর, এসব ভুলে ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এল। বহুক্ষণ ধরে মারামারি চালাল ওরা, পরস্পরকে ঠেসে ঠেসে ধরল দেয়ালে, অবিশ্যি মুখের ভাবটা এমন করলে যেন মোটেই মারামারি নয়, একটা রগড় হচ্ছে।

গেনার জামার বোতাম ছিঁড়ল প্রথমে, তারপর পমেরানচিকের। যখন তৃতীয় বোতাম ছেঁড়ার পালা তখন ওদের নিয়ে যাওয়া হল শিক্ষকদের ঘরে।

'বসে একটু মাথা ঠান্ডা করে নাও তো দেখি,' সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে শান্তভাবে বললেন অঙ্কের শিক্ষক।

দুজনেই বাধ্য হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে যখন বেরিয়ে আসছিল, তখন চাপা গলায় জানিয়ে দিলে গেনা:

'সৌর বায়ু সম্পর্কে কবিতা — সে লিখেছে ল্যুবকা। লিখতে হলে ঐ রকম!'

পমেরানচিকের এবার খেয়াল ছিল যে সে মনিটর, তাই কিছু না করে কেবল কিল দেখাল।

ক্লাসের পর ল্যুবকা, গেনা আর বরকার পেছু পেছু ছুটে গেল রেডিও টেকনিকের ডিউটিম্যান:

'এক্ষুনি এসো তোমরা, প্রতিনিধিদল এসেছে তোমাদের কাছে।'

'প্রতিনিধিদল? আমার বোতাম যে ছেঁড়া,' নিজের জামার কলার দেখাল গেনা।

'ওতে কিছু হবে না। কারো নজরে পড়বে না,' সান্ত্বনা দিলে ডিউটিম্যান।

রেডিওর ঘরে দেখা গেল আট জোড়া উল্লসিত গোল গোল চোখ। আটজন প্রতিনিধি সমস্বরে জানাল যে তারা প্রথম শ্রেণীর 'ক' 'খ' 'গ' ও 'ঘ' শাখা থেকে আসছে। লাইন টানা কাগজে লেখা একটা তালিকা বাড়িয়ে দিলে তারা।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করলে হেড ডিউটিম্যান।

সমস্বরে প্রতিনিধিরা জানাল, 'এটা তালিকা।'

'কীসের তালিকা?'

'"স্পুৎনিক" রেডিও-গেজেটের জন্যে।'

'দেখি তো কী ব্যাপার!'

তারপর জোরে জোরে পড়ে শোনালে ডিউটিম্যান:

'১। নাতাশা বিলোভা।

২। আলিক পেত্রোভ।

৩। নিনা হিব্রোভা।

৪। কান্তিয়া স্মিরনভ।

৫। ইওজিক কভাল্স্কি।

এই ছাত্রছাত্রীদের জন্ম দিন ৪ঠা অক্টোবর। প্রথম স্পুৎনিকের জন্মদিনও ৪ঠা অক্টোবর। অনুরোধ করি, এই তালিকাটা যেন "স্পুৎনিকে" পড়ে শোনানো হয়।'

'বাঃ,' গুরুত্ব দিয়েই বললে ডিউটিম্যান, 'পরের বার আমাদের রেডিও-স্পুৎনিকে নিশ্চয় ব্রডকাস্ট করা হবে এটা।'

বিজয় গর্বে চলে গেল প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা।

ল্যবকা কনুই দিয়ে গুঁতো মারলে বরকার পাঁজরায়, বরকা মারলে গেনাকে, আর তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ব্রডকাস্ট সাকসেসফুল!

বরকার ইনটারভিউ

অবশেষে সেই সকালটা এল। তারার স্বপ্নদ্রষ্টারা অবাক হয়ে সানন্দে জেগে উঠল ঘুম থেকে। 'এরই মধ্যেই?' বলাবলি করলে তারা, যেন বিশ্বেস হচ্ছিল না, যেদিনটার কথা তারা এতদিন ভেবে এসেছে, সেটা এসে গেছে, শান্তভাবে আলো দিচ্ছে।

যেই হোক না কেন — বয়স্ক বা কিশোর, অভিজ্ঞ, জীবনের পোড় খাওয়া, অথবা জ্বলজ্বলে চোখের বাচ্চা — সবার হৃদয়ই ১৯৬০ সালের মে মাসের এক সকালে উল্লাসে দুর দুর করে উঠল। শুনল তারা: জাহাজ! জাহাজ ভেসেছে! কিন্তু আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টাদের যা খুশি করে তুলল সেটা কোনো পাল তোলা জাহাজ নয়, নয় লাইনের ক্রুইজার, নয় আকাশের লাইনার — এ জাহাজ হল নতুন এক সদ্যজাত ব্যোমযান। গ্রহের ওপর উড়ল এক ব্যোমযান-স্পুৎনিক। স্থির বুঝলে স্বপ্নদ্রষ্টারা, "মহাজাগতিক জাহাজ যখন তৈরি হয়ে গেছে, তখন তাতে যাত্রীও উঠবে। এ ছাড়া হতেই পারে না।"

সে জাহাজ যে গতিতে ছুটল ঠিক সেই গতিতেই ভূগোলক ফের প্রদক্ষিণ করলে একটা নতুন শব্দ। রুশী ধ্বনির সে শব্দটা শোনা গেল ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী ভাষায়। শোনা গেল জমকালো মীড়ে। সে শব্দ যারাই উচ্চারণ করলে, তারাই জানত যে এবার মাথার ওপরে যেটা উড়ছে সেটা আর ছোটো একটা গোলা নয়, পুরো একটা কামরা — গরম, আয়েসী, হাওয়াভরা

একটা কামরা। আর তার চারপাশে মহাকাশের শূন্যতা — একেবারে শূন্যতা যদি বা না হয় তাহলেও সেখানে গ্যাসের চাপ কেবিনের ভেতরকার বাতাসের চাপের চেয়ে দশ হাজার কোটি ভাগ কম। এ কামরার জন্যে ভয়ই হয় বৈকি: হঠাৎ যদি সইতে না পারে দেয়াল, কামরা বিস্ফোরিত হয়ে যায়?

জাহাজ কিন্তু পাকের পর পাক দিয়ে গেল, আর কেবিনের ভেতরে তাপ আর বাতাস বজায় রইল ঠিক আগের মতোই, ঠিক যেন একটা ঘর।

এমন জোরদার কামরা যখন বানানো গেছে তখন নতুন বাসিন্দেও জুটবে!

কখন অন্ধকার হয়ে আকাশের সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারাটিকে দেখা যাবে তার জন্যে স্বপ্নদ্রষ্টাদের আর তর সইছিল না। বাইনোকুলার, দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখার দরকার নেই, খালি চোখেই সে ব্যোমযান দেখা যাবে। কিন্তু অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠল তারা।

মহাসাগরের ঊর্মিমালারা দোলে,
শুধু জেগে আছে মহাগগনের তারা,
সে সিন্ধু বেয়ে জাহাজ চলেছে একা,
চলেছে, চলেছে, সবকটি পাল তুলে।

কবি লের্মন্তভ কি এর কথাই ভেবেছিলেন? নিশ্চয় ভাবেননি, সন্দেহ নেই তাতে। তবে বিষণ্ণ কেন সবাই? হাজার হাজার লোকে চেয়ে দেখছে রাত্রির আকাশে, আর বাকি হাজার হাজার লোক হতাশ হয়ে উঠছে, কারণ তারা জানে, এই আশ্চর্য জাহাজটা তাদের দেশের ওপর দিয়ে উড়ছে কেবল দিনের বেলা, যখন তা দেখা সম্ভব নয়।

শোনা যায় নাকো সারেঙের কোনো হাঁক,
দেখা যায় নাকো মাঝিমাল্লার মুখ...

না দেখা যায় না... এ জাহাজে সারেঙ নেই... মানুষের বদলে ফাঁকা কেবিনের মধ্যে শুধু কতকগুলো মালপত্তর... আর সারেঙের দরকার আছে কি? জীবনের ঝুঁকি নেওয়া প্রয়োজন? অতি বাধ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলোই কি বেশি ভালো নয়? মহাজগতে যে আছে বিপজ্জনক কিরণ। বন্দুকের গুলির চেয়ে শতগুণ বেগে সেখানে ছুটোছুটি করছে উল্কা। বীজের মতো এইটুকু হলেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে বিপদ — জাহাজের গা ভেদ করে যাবে তারা! এক্ষেত্রে কোনো উপায় নেই মানুষের। বিপদটা কী তা বুঝতে না বুঝতেই দুই-এক সেকেন্ড কেটে যাবে আর সেই সেকেন্ড দুয়ের মধ্যেই জাহাজ ছুটে যাবে বহু কিলোমিটার। তার চেয়ে ইলেকট্রোনিক 'মস্তিষ্কের' ওপর ভরসা রাখাই কি বেশি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

সত্যি, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলোর ওপরই ভরসা রাখা ভালো। রকেট চালাবে তারা, বিপদ আন্দাজ করবে, যাত্রাপথ পালটে দেবে।

তাহলেও জাহাজে ক্যাপটেন একান্ত অবশ্যক! ক্যাপটেন নইলে কে উড়ে গিয়ে দেখবে চান্দ্র সাগরগুলোকে, মোচন করবে মঙ্গলগ্রহের রহস্য? ক্যাপটেন নইলে কে যাত্রাপথে রকেট থামিয়ে অপেক্ষা করবে অজ্ঞাত গ্রহের আগমনের জন্যে? কেই বা হুকুম দেবে বাধ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রদের! স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র — তারা শুধু মাঝিমাল্লা। ক্যাপটেন হতে হবে মানুষকে!

এমনি সব ভাবনা ঘুরছিল স্বপ্নদ্রষ্টাদের মাথায়। রাত্রির আকাশে তারা চোখ মেলে ব্যোমযান-স্পুৎনিকটির দেখা পাবার আশায়, আর কল্পনায় পাখা মেলে দূর গ্রহনক্ষত্রের দিকে।

আর তাদের মধ্যে সত্যকার মহাজাগতিক ক্যাপটেনও ছিল বৈকি। সবার মতো সেও তাকিয়ে দেখছিল আকাশে। উড়ন্ত ব্যোমযানটিতে থাকার খুবই ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু সম্ভব হয়নি। এখনো তো কোনো ব্যোমযান পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে মাটিতে ফিরে আসতে পারেনি; ডাক্তাররা এখনো অবতরণের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিতি দেয়নি। খুবই ক্ষোভের কথা বৈকি: মহাজগতের দরজা খোলা, অথচ চাবিটি নেই।

শেষ ধাপটির জটিলতা বুঝতে পারছিল সবাই, অপেক্ষা করছিল কী ভাবে মোড় নেবে ঘটনা ...

অচিরেই টেলিগ্রাফে সংবাদ এল:

"ভূ-পদার্থ রকেটের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তর ও মহাজাগতিক শূন্যদেশের পর্যবেক্ষণ চলছে সোভিয়েত ইউনিয়নে ...

"গবেষণা কর্মসূচি অনুসারে ১৯৬০ সালের জুন মাসে এক ধাপী ব্যালিস্টিক রকেট ক্ষেপণ করা হয় ...

"রকেট ক্ষেপণ সফল হয়। নির্দিষ্ট উচ্চতা ২০৮ কিলোমিটারে পেঁছিয় রকেট ...

"অবতরণের পর রকেটের অভ্যন্তরে জীবজন্তুদের অবস্থা ভালো।

"বেপরোয়া কুকুরটি তার পঞ্চম মহাজাগতিক সফর সম্পন্ন করল ..."

শান্ত এই কটি ছত্রের ফলে সাত সকালে ইনস্টিটিউটের দোরগোড়ায় দেখা গেল অধীর রিপোর্টারদের ভিড়। বরাবরের মতো তাড়াহুড়ার অন্ত নেই ওদের। আর এই সমারোহের আসামীরা কিন্তু তাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখল: বাড়িটার কোন এক গহন কক্ষে তখন তাদেরকে পরীক্ষা করছিল ডাক্তাররা।

গেটের কাছে ভিড় জমাল রিপোর্টাররা। যারা দেরি করে আসছিল, তাদের নিয়ে রসিকতা করছিল।

কাঁধে টেপ রেকর্ডার ঝোলানো আলুথালু চেহারার একটি লোক এল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'এর মধ্যেই চলে গেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলে হতাশ হয়ে।

'তোর সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারে কখনো?' কে একজন বললে রগড় করে। 'শিগগির মাইক্রোফোন লাগা। ব্রডকাস্ট শ্বর্ব হচ্ছে! হ্যালো, হ্যালো!' রেডিও ঘোষকের কণ্ঠস্বরে বলতে শ্বর্ব করলে রসিক লোকটি। 'প্রিয় বন্ধ্বগণ, আমরা এখন বিজ্ঞান-ইনস্টিটিউটের আঙিনায়। বিশ্ববিখ্যাত মহাকাশযাত্রীর সঙ্গে এবার আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব, এখন সে কেমন বোধ করছে সে বিষয়ে মাইক্রোফোনে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে অন্বরোধ করব তাকে। খচমচ শ্বনতে পাচ্ছেন? মহাকাশযাত্রীটি একটি খরগোস, নাম 'তারকা'। মহোৎসাহে সে ঘাস আর বাঁধাকপি খাচ্ছে। তার মানে, স্বাস্থ্য চমৎকার!'

এই রগ্বড়ে বক্তৃতা শ্বনে সকলের সঙ্গেই হেসে উঠে বললে রেডিও রিপোর্টারটি:

'বাঁধাকপির খচমচ আর কতটুকু! বাতাসের শনশন শোনার জন্যে আমি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়েছিলাম মাইক্রোফোন নিয়ে, জানেন। আপনাদের এই নিঃশব্দ কাগজে কি আর ঝড়ের জোর ধরা যায়?'

ঘটনাটা সত্যি। রেডিও শ্রোতারা সবাই শ্বনেছিল কী ভাবে ঝড় ফুঁসছে প্রশান্ত মহাসাগরে, আর সে সময় কী ভাবে কাজ করছে জাহাজের লোকেরা। তরঙ্গের ঝাপটা, ঝড়ের গোঁ-গোঁ, জাহাজের ইঞ্জিনের নিশ্চিন্ত ধক ধক আর প্রাকৃতিক দ্বর্যোগের সঙ্গে লড়াইয়ের সমস্ত স্বাভাবিক শব্দগ্বলো শ্বনে সাহসী নাবিকদের জন্যে গর্বে ব্বক ভরে উঠেছিল শ্রোতাদের। বেশ কাজ দেখিয়েছিল রেডিও-রিপোর্টার।

ডাক্তারের আলখাল্লা পরা একটি ফিটফাট মেয়ে বেরিয়ে এল সদর দরজা থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরল রিপোর্টাররা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল ভালিয়া। এই মনোযোগ, গরম কালের ভোর বেলাকার এই তাজা হাওয়া, আর অল্পদিন আগেই সে যে প্বরো ডাক্তার হয়ে উঠেছে এই ঘটনা — সব মিলিয়ে আনন্দ তার আর ধরে না!

'কোথায়, আমাদের বীর নায়িকাটি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে রিপোর্টাররা।

'ওদেরকে এখনো পরীক্ষা করা হচ্ছে। শিগগিরই আসবে। আপাতত আপনারা কী শ্বনতে চাইছেন বল্বন? মহাকাশযাত্রার কথা?'

'না, না, প্রথমে আপনার নিজের কথা। কী ভাবে আপনি মহাজাগতিক ডাক্তার হলেন তার কাহিনী।'

লাল হয়ে উঠল ভালিয়া: এবার থেকে যে ও মহাকাশযাত্রী কুকুরদের ট্রেনিং দেবার ভার পেয়েছে, সেটা এরা টের পেলে কী করে?

জবাবে বললে, 'খ্ববই সোজা। স্কুল শেষ করলাম, এখানে কাজ করতাম ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে। সেই সঙ্গে ইনস্টিটিউটেও পড়তাম। এখন ডাক্তার হয়েছি।'

'এবার ওড়ার ঘটনাটা।'

ভালিয়া বলতে শুরু করলে:

'দিনটা খুব ভালো ছিল, মানে ঠিক আজকের মতোই। বেশ শান্ত হয়ে ছিল বেপরোয়া, তার প্রভাব পড়েছিল পোণা'র ওপর, সে এর আগে কখনো ওড়েনি। আর তারকা খরগোসটার কথা তো বলবারই নয়। ওটার দিকে তাকালে কে বলবে যে খরগোসরা ভীরু প্রাণী। তারপর সবাই রেডি। এক ঘণ্টা ... তিরিশ মিনিট ... পনেরো ... স্টার্ট! যাত্রা চলল স্বাভাবিকভাবেই। রকেট অবতরণের সময় বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম আমরা। এবারকার রকেটটা খুব ভারি কিনা। কিন্তু সবই চমৎকার উৎরাল। মস্ত একটা প্যারাশুট খুলে গেল। হেলিকপ্টারে করে আমরা গেলাম অবতরণ স্থলের দিকে।'

'একটা প্রশ্ন করতে পারি,' জিজ্ঞেস করলে একজন সাংবাদিক, 'যে রকেটটায় কুকুর আর খরগোস উড়েছিল তার ওজন দু টনের বেশি। আমাদের প্রথম স্পুৎনিক ব্যোমযানটার কেবিনের ওজন প্রায় তাই। আপনি কী মনে করেন, ভবিষ্যৎ ব্যোমযানের অবতরণের দিক থেকে বেপরোয়ার সাফল্যের তাৎপর্য কতটা?'

'মানে,' মাথা ঝাঁকালে ভালিয়া, 'আমি ইঞ্জিনিয়র নই, তাহলেও জবাব দেবার চেষ্টা করব। পৃথিবীর চারপাশে ব্যোমযানের প্রদক্ষিণ আর খাড়াইভাবে রকেটের ওঠা — এ দুটো অবশ্যই বিভিন্ন ব্যাপার। যেমন, অবতরণের আগে ব্যোমযানের গতি শব্দের চেয়ে বহুগুণ বেশি, আর তার খোল গরম হয়ে ওঠে দুই এমন কি তিন হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। কিন্তু যে-সব পরীক্ষা করা হয়েছে তা থেকে কি আর ব্যোমযান রক্ষার মতো খুব জটিল কোনো পদ্ধতি বার করা যায় না? ভেবে দেখুন, একটা লরি — আমাদের রকেটটা একটা লরির মতোই ভারি — সেই লরিকে একেবারে মহাকাশে পাঠাতে কী রকম শক্তি দরকার। তারপর সে লরিকে সাবধানে মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে প্যারাশুট — তার মধ্যে আবার তিনটে জ্যান্ত প্রাণী! তার ওপর বুঝে দেখুন, এই তিনটে প্রাণী — বেপরোয়া, পোণা আর তারকা — একটি আঁচড়ও গায়ে লাগেনি এদের। খুবই অবাক কাণ্ড নয় কি?'

'সত্যি খুবই চমৎকার,' যে সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিল সে সায় দিলে, 'আপনি ইঞ্জিনিয়র না হলেও ইঞ্জিনিয়রিং নিখুঁতত্বের ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না। ধন্যবাদ!'

'ঐ যে, এসে গেছে,' উৎফুল্ল হয়ে কে যেন বললে।

খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল ইওলকিন, তার সঙ্গে দুটি শাদা কুকুর।

মুহূর্তের মধ্যে মহাকাশযাত্রীদের চারপাশে শুরু হয়ে গেল সানন্দ হৈচৈ।

তিনটি পাত্রপাত্রীকে যত রকম বিন্যাসে বসিয়ে ছবি তোলা সম্ভব, তার সবকটি পরখ করে দেখল ফোটোগ্রাফাররা।

ফোটোগ্রাফারদের বাধা দিয়ে সোরগোল তুলে কিনো ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে এল ক্যামেরাম্যান। আচমকা আচমকা সব প্রশ্ন নিয়ে ডাক্তারকে আক্রমণ করলে সাংবাদিকরা। নাছোড়বান্দা একটি তরুণ রিপোর্টারের প্রশ্নে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কিছুতেই জবাব দিতে পারল না কী বেশি ভালোবাসে বেপরোয়া, বিফ্‌স্টিক নাকি হালুয়া?

কেবল টেপ রেকর্ডার কাঁধে রেডিওর লোকটিই একটুও চঞ্চল না হয়ে দেখতে লাগল এসব কাণ্ড। তারপর ফোটোগ্রাফাররা একটু শান্ত হলে কুকুরগুলোর কাছে এগিয়ে গেল সে।

'নে বেটি, এবার একটু ডাক তো!' বেপরোয়ার মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে কথাগুলো এমন অনায়াসে ও বললে যে কেউ হেসে উঠল না।

রোদের ছটায় চোখ মিটমিট করলে বেপরোয়া, গরমে জিভ বার করে গম্ভীর চোখে চাইল মানুষটার দিকে। বুঝতে পারল না কী চায় মানুষটা।

পোণা কিন্তু তার জায়গা ছেড়ে মস্ত এক লাফ দিয়ে কুকুরসুলভ স্বতঃস্ফূর্ততায় চেটে নিলে রেডিও রিপোর্টারের নাক।

'এই রে!' চেঁচিয়ে উঠল রেডিও রিপোর্টার, 'এর জন্যে কিন্তু ডাক শোনাতে হবে তোকে!'

আনন্দের পরিপূর্ণতায় সত্যিই ডেকে উঠল কুকুরটা।

ব্রডকাস্টের জন্যে অত্যন্ত জরুরী এই শব্দটা রেকর্ড করে নিয়ে রেডিও রিপোর্টার আঙিনা পার হয়ে ঘাসের ওপর জায়গা নিয়ে মাইক্রোফোনে ব্রডকাস্ট করতে লাগল:

'হ্যালো, হ্যালো! আমরা এখন ইনস্টিটিউটের আঙিনায়। এখান থেকেই মহাকাশযাত্রায় পাঠানো হয়েছিল বেপরোয়া আর পোণা এই কুকুরদুটিকে, আর তারকা নামের খরগোসটিকে। গোলমাল শুনতে পাচ্ছেন তো? পৃথিবীতে ফিরে আসা মহাকাশযাত্রীদের সঙ্গে সাংবাদিকরা, বলা যেতে পারে, ইনটারভিউ নিচ্ছেন ...'

রেডিও রিপোর্টার আরো কী কী বললে, সেটা তার সঙ্গীদের কানে যায়নি, খুব একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার দিকে তাদের সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়েছে তখন।

কেবল দরোয়ানের নজরে পড়েছিল, গেট এড়িয়ে দুটি সাবলীল মূর্তি বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। রেলিং বরাবর চুপিচুপি ছেলেদুটির পিছু ধাওয়া করে দরোয়ান, গাছের পেছন থেকে গিয়ে ছেলেদুটিকে ধরতে যাবে, অমনি ওরা ছুটতে শুরু করে সামনে। সমস্ত আলাপ পণ্ড হয়ে যায় উত্তেজিত ছেলেমানুষী গলার আওয়াজে।

'তিয়াপা! তিয়াপা!' ছুটতে ছুটতে চেঁচাচ্ছিল শাদাচুলো ছেলেটা।

আর অমনি একটা মস্ত লাফ দিয়ে তার দিকে ছুটে যায় বেপরোয়া, ঘাসের ওপর দিয়ে লটপট করতে থাকে তার লম্বা চেনটা। ছেলেটার বুকের ওপর লাফিয়ে উঠে তার সমস্ত মুখ চেটে নেয় এক লেহনে।

বরকা উবু হয়ে বসলে, কোলের ওপর টেনে নিলে তিয়াপার মাথাটা, তারপর ওর নরম লোমে হাত বুলিয়ে সোহাগী চিরপরিচিত চোখদুটির দিকে চেয়ে কী এক অদ্ভুত গলায় কথা বলতে শুরু করে দিলে। সে স্বরে একই সঙ্গে বেজে উঠছিল শোক, অতীত হতাশা আর আনন্দ।

'তিয়াপা, তিয়াপা,' বরকা বলছিল কেবল ওরই দিকে চেয়ে, 'এই যে আমি। আমায় মনে আছে তো? চিনতে পেরেছিস? এমন বোকামি হয়েছিল, ভেবেছিলাম আর কক্ষনো, কক্ষনো বুঝি তোর সঙ্গে দেখা হবে না ... কী বড়ো হয়ে গেছিস তুই, জোর বেড়েছে গায়ে। বেশ ভালো আছিস তো তিয়াপা, মন কেমন করেনি আমার জন্যে?'

ভূতপূর্ব মনিবের মুখের দিকে তাকালে তিয়াপা, তার লেজটা বলছিল, অতীত ক্ষোভটা সে বহুদিন আগেই ভুলে গেছে, খুবই মন কেমন করত তার। এখন সে খুশি, শুধু খুশি নয়, সুখী!

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ এগিয়ে এল ওদের দিকে। তিয়াপা মাথা ঘুরিয়ে তাকাল তার চশমার পিছনে মিটমিট করা চোখের দিকে, লেজ তার আরো জোরে নড়তে লাগল। হ্যাঁ, বরকাকে দেখে, তার কথা শুনে তার আর আনন্দ ধরে না। তার ওপর এই ভালো লোকটির সঙ্গে থেকেও তার ভারি আরামে কেটেছে। দুদিক থেকেই সে সুখী।

'এটা তোর কুকুর?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে ইওলকিন, 'আয়, পরিচয় করে নিই!'

বরকা উঠে দাঁড়াল, মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল তার:

'হ্যাঁ, এটা আমার তিয়াপা! অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। আর দেখি...' কথা শেষ করতে পারলে না বরকা। তার চারিদিকে ততক্ষণে ঘিরে এসেছে অসংখ্য কৌতূহলী মুখ।

'এই, এ একটা দৃশ্য বটে!' সানন্দে বললে কে একজন সাংবাদিক, 'বেপরোয়াকে তুই তাহলে ডাকতিস তিয়াপা বলে? মজার ব্যাপার।'

প্রশ্নবর্ষণ শুরু হয়ে গেল বরকার ওপরে।

'কেমন করে হারিয়েছিল ও?'

'কী কী অভ্যাস ছিল ওর?'

'আচ্ছা বলতো, বিফ্‌স্টিক ভালোবাসত কি?'

'অনেক দিন ধরে খুঁজছিলি ওকে?'

এ ছাড়াও এত বেশি প্রশ্ন যে বরকা তিয়াপা সম্পর্কে যা জানত সবই বলতে হল তাকে।

অনধিকার প্রবেশকারী দ্বিতীয় ছেলেটির কথা ভুলে গিয়েছিল সবাই। কেবল একজন সাংবাদিক মন দিয়েছিল তার দিকে।

'ঠিক জানতাম, তুই!'

'বাবা, তিয়াপাকে খুঁজে পাওয়া গেছে!' খুশি হয়ে উঠল গেনা।

'সে তো স্বচক্ষেই দেখলাম,' বললে আনাতোলি ইয়েভগেনিয়েভিচ।

বরকার কাহিনী যখন শেষ হল, তখন রিপোর্টারদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় রিপোর্টার কারাতেভ এসে দাঁড়াল তার কাছে।

'ভারি আনন্দ হল বরকা। যে কাণ্ডটা হয়েছিল তাতে ভারি দুঃখ ছিল আমার।'

'তা ঠিক,' বরকা স্বীকার করলে, 'আমাদের দোষ হয়েছিল, আমার আর গেনার। কিন্তু হয়ত...' চোখ ওর ধূর্তের মতো চিকচিক করে উঠল, 'তিয়াপা না হারিয়ে গেলে তো সে আর

বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারত না। এখন গোটা দুনিয়ার লোক ওকে জানে।'

এ আবিষ্কারে নিজেই অবাক হয়ে যেন কথা থেমে গেল বরকার। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে বললে:

'মাঝে মাঝে এখানে এসে ওকে দেখে যাব — এতে আপত্তি করবেন না তো কমরেড ডাক্তার? আমি আর গেনা আসব, কোনো গোলমাল করব না।'

'নিশ্চয়,' অনুমতি দিলে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, 'নিশ্চয়, আসবে বৈকি।'

'বরকা, বরকা রে!' বন্ধুকে পেছন থেকে ঠেলা মারলে গেনা, 'কী সুখ তোর মাইরি। তিয়াপাকেও খুঁজে পেলি, তার ওপর সে আবার এক বিখ্যাত মহাকাশযাত্রী।'

বাপের দিকে মুখ ভার করে তাকাল গেনা: সৌভাগ্যের কেন যে এমন অসম বণ্টন হয় পৃথিবীতে।

কিন্তু বরকা শুনছিল না তিয়াপার কাছ থেকে সে বিদায় নিচ্ছিল।

কানে কানে বললে, 'ফের আসব তিয়াপা, মন খারাপ করিস নে, ফের আসব!'

মহাজগতের চাবি

কিছু দিন যেতে না যেতেই পৃথিবীর ওপর দিয়ে উড়ল দ্বিতীয় মহাজাগতিক ব্যোমযান। তাতে যাত্রী ছিল স্ত্রেলকা আর বেলকা।

বৈজ্ঞানিকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন: টেলিস্ক্রীনের ওপর যে দুটি মূর্তি ফুটল তাদের একেবারে নড়নচড়ন নেই। বেঁচে আছে তো ওরা?

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করল ব্যোমযান আর তখন জীবন্ত হয়ে উঠল মূর্তিদুটো — নড়েচড়ে উঠল যাত্রীরা। ঈষৎ উটকো নাক স্ত্রেলকার শাদা মুখটা নড়ে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেঁচে আছি আমরা!" ফুর্তিতে নড়ে উঠল তার কালচে কান আর চোখের কালি। আর বেলকা, লোমশ শাদা বেলকা মাথা তুললে, "না, না, আমরা ভড়কাইনি। ভাবনা নেই!.."

অবাধ্য, জোরালো পাগুলো তারা প্রথমটা তেমন বাগে আনতে পারেনি। পাগুলোর এই দুর্বোধ্য আচরণে ক্ষেপে গিয়ে তারা খানিকটা ঘেউ ঘেউ করেও ওঠে। পরে এই অস্বাভাবিক লঘুতার সঙ্গে মানিয়ে নেয় নিজেদের; মেজাজ ফিরে পেয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয় খাবার দিকে। মহাজগতে প্রথম প্রাতরাশ সেটা।

এ যেন এক মহাজাগতিক ওয়ালজ নাচের ঘুরন। কেবলি ঘুরতে থাকল ব্যোমযান; ছুটতেই থাকল
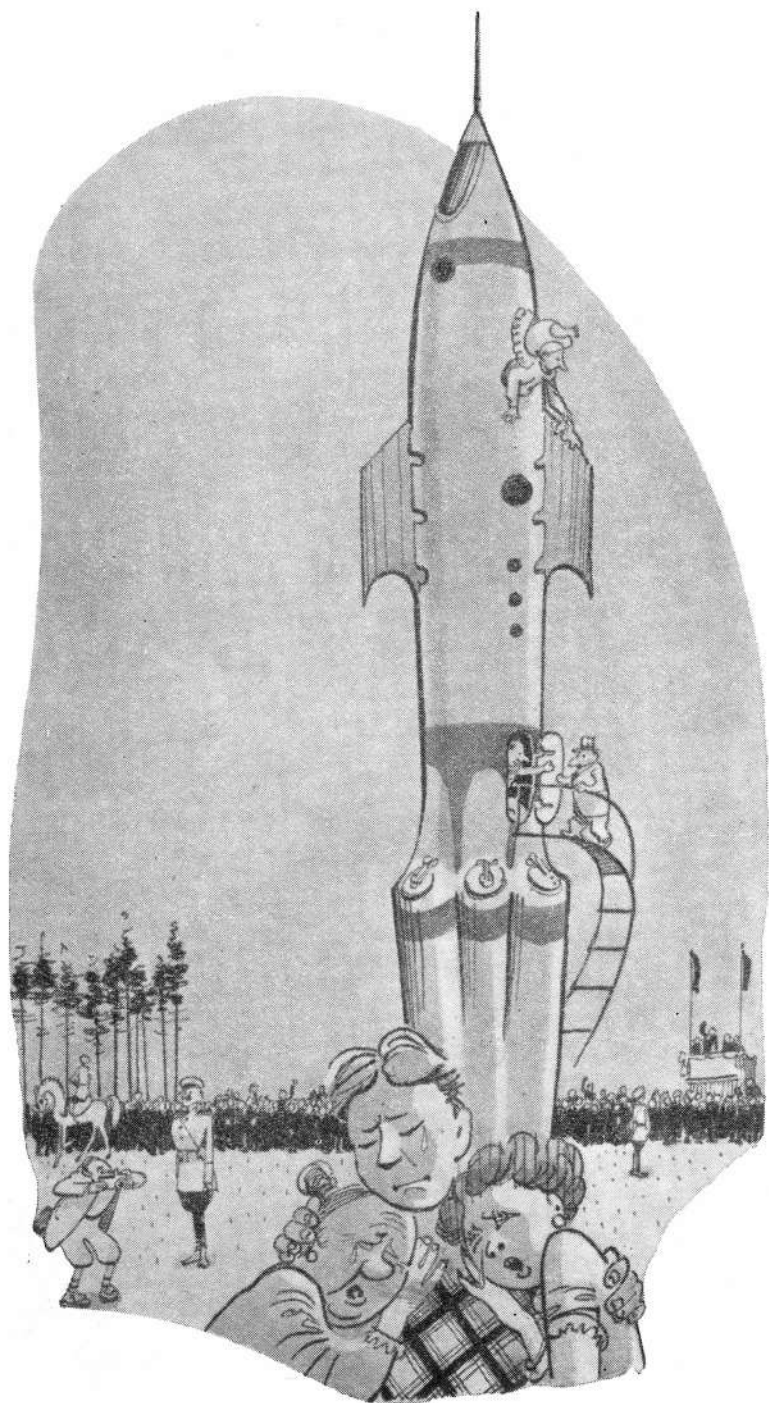
ভারহীন যাত্রীরা। তাদের কাছ থেকে আগত জীবন্ত রিপোর্টাজ অবিচ্ছিন্ন পাঠ করে চললেন বৈজ্ঞানিকেরা।

51
মস্কো-ধ্রুবতারা
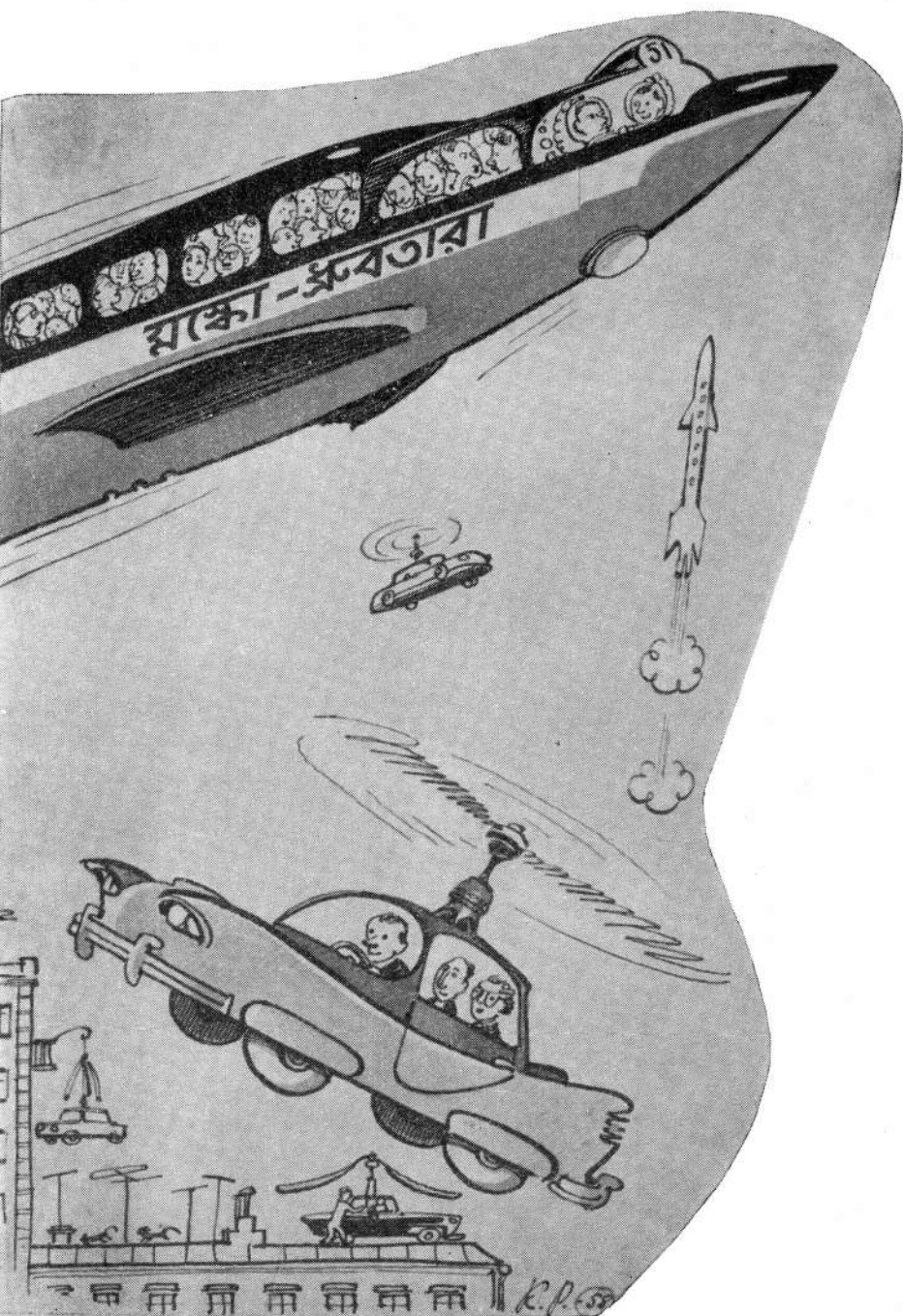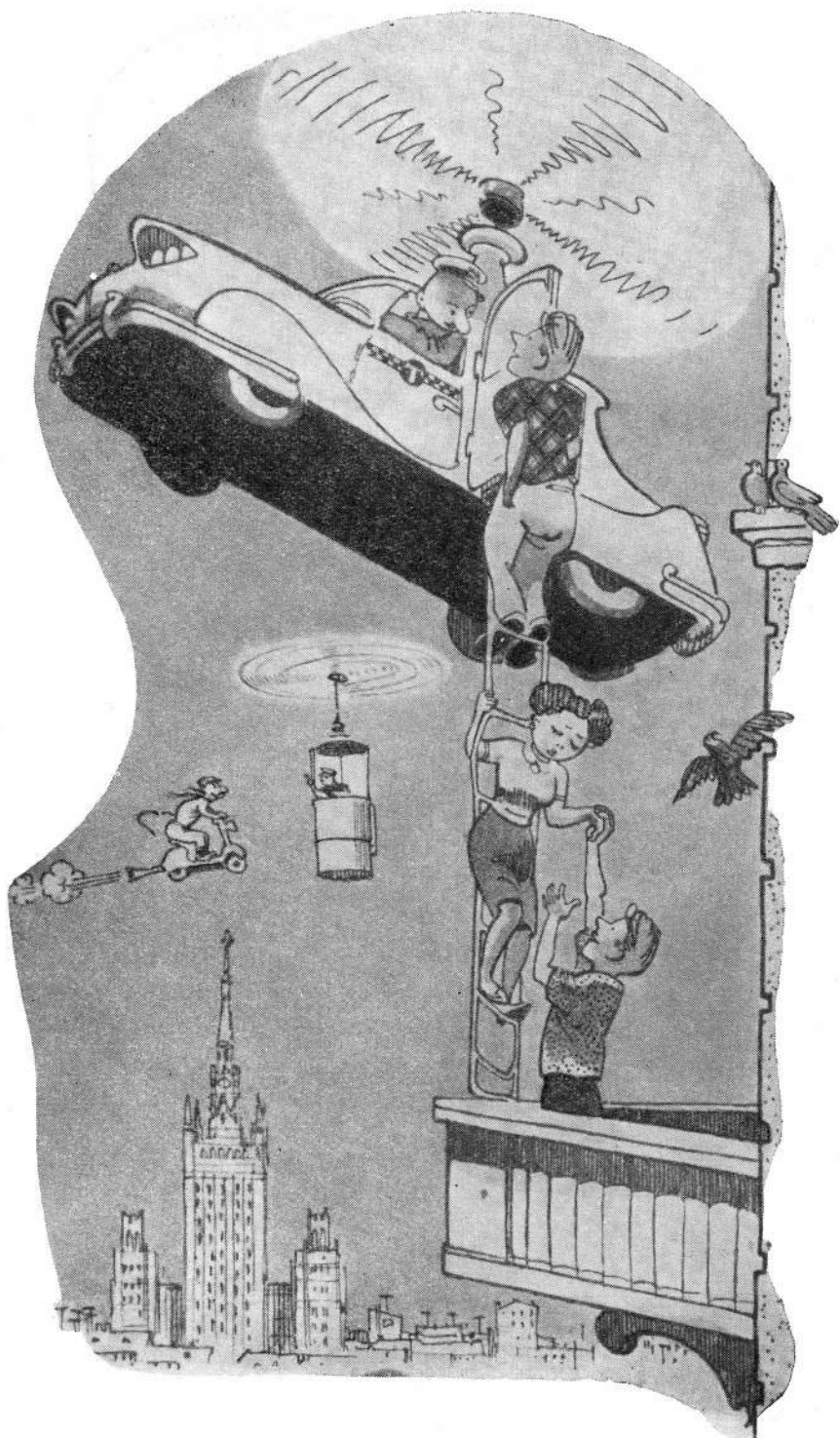
"শুনুন, শুনুন, শুনুন!" সারা পৃথিবীর রেডিওতে খবর এল, "বেলকা আর স্ত্রেলকা, ইঁদুর আর নেংটি — গোটা জীবজগতই বেঁচে আছে, কুশলে আছে!"

পৃথিবী থেকে সংকেত পেয়ে ব্যোমযান তারপর অবতরণ করতে লাগল। উপরে খুলে গেল প্যারাশুটের শাদা ছাতা, মহাকাশযাত্রীদের নামিয়ে দিলে একটা ক্ষেতের মাঝখানে। লোকে কাজকর্ম ফেলে ছুটল এই তাজ্জব অতিথির কাছে।

"ব্যাপার দ্যাখো দিকি!" খুশি হয়ে উঠল যৌথখামারীরা, "কাজ করছি আমরা, ট্র্যাক্টরে জমি চষছি, হঠাৎ কিনা রকেট, একেবারে মহাকাশযাত্রীরা এসে হাজির। ধন্যি বাবা! এ যে একেবারে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি। জন্মে কখনো দেখিনি! খুব ভাগ্যি করে এসেছিলাম বটে!"

হেলিকপ্টারে করে উড়ে এলেন বৈজ্ঞানিকেরা। স্ত্রেলকা আর বেলকাকে কেবিন থেকে বার করে ছেড়ে দিলেন তাঁরা, পরস্পরকে অভিনন্দন জানিয়ে কোলাকুলি শুরু করে দিলেন। তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার আর কী হতে পারে — বেলকা আর স্ত্রেলকাকে পেয়েছেন তাঁরা, মাটিতে নেমে আসা প্রথম মহাকাশযাত্রী!

'এরা যে আমাদের এনে দিলে মহাজগতের চাবি!' আমুদে কুকুরদুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন একজন বৈজ্ঞানিক। তারপর তাকালেন ক্ষেতের দিকে, শাদা প্যারাশুটটা পড়ে আছে সেখানে। বললেন, 'লেনিনগ্রাদে আছে কুকুরের স্মৃতিস্তম্ভ, প্যারিসে ব্যাঙের স্মৃতিস্তম্ভ। আকাদেমিশিয়ান ইভান পেত্রভিচ পাভলভ আর

ফরাসী দেহবিজ্ঞানী ক্লদ বের্নার মনে করতেন, বিজ্ঞানের সেবায় এই প্রাণীগুলির অবদান মহান, তাই চিরস্মরণীয় করে গেছেন তাদের। একদিন এখানে, এই ক্ষেতের মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ উঠবে মহাকাশ থেকে প্রথম সফল অবতরণের, স্ত্রেলকা আর বেলকার সম্মানে। আরো একটা স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে কোথাও — সেটি লাইকার।'

বিজ্ঞানীর এ কথা যারা পরে শুনেছিল, তারা সায় দিয়েছিল তাতে। সদানন্দ বীর প্রথম মহাকাশযাত্রীদের তারা ভালোবেসেছিল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ঘটনাটাকে সবাই অভিহিত করেছে একটা মহাকীর্তি বলে। এ কীর্তি আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের, ইঞ্জিনিয়রদের, টেকনিশিয়ানদের, শ্রমিকদের আর ডাক্তারদের।

শহরের মধ্যে আছে একটি ছোট্ট ফুলে ভরা পার্ক, তার মধ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। অন্য সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ থেকে এটা একেবারে ভিন্ন। একটা ধূসর উঁচু বেদীর ওপর স্থাপিত ৎসিওলকভস্কির আবক্ষ মূর্তি। মূর্তিটি গোলাপী পাথরে ক্ষোদাই, তাই খুব মেঘলা দিনেও মনে হয় যেন বিজ্ঞানীর মুখটা রোদে ঝলমল করছে।

এখানে প্রায়ই আসে দুটি মানিক জোড় — বরকা আর গেনা। সবসময়েই কিছু না কিছু একটা আলোচনা করে তারা, মরীয়ার মতো তর্ক করে। কী করে তর্ক না করে পারে, মহাজগতের সব কিছু যে এখনো বিজ্ঞানের কাছেও প্রাঞ্জল পরিষ্কার নয়!

তার্কিকদের কাছেই, হয় একই বেঞ্চিতে নয় অন্য কোনো একটায় সাধারণত সে সময় বসে থাকে ঢল ঢল চোখের একটি মেয়ে। আলোচনাটা যদি শান্তভাবে কাজের লোকের মতো চলে, তাহলে সে ছেলেদুটোর দিকে কোনোই মন দেয় না, আকাশের দিকে তাকিয়ে পা নাচাতে নাচাতে আপন মনে গুঞ্জন করে:

রকেটে কেন তারা?
কিরীটে দেখি তারা;
নিশানে লাল তারা,
গগনে জ্বলে তারা!..

এই পার্কেরই সবচেয়ে নির্জন কোণটায় বসে থাকে শিল্পী। কিছুদিন থেকে সে একটু ভালো বোধ করছে, খোলা হাওয়ায় কাজ করাই তার পছন্দ। যখন সবকিছুই বেশ ভালো চলে, ছবিটা উৎরোয়, তখন মুখে হাসি ফোটে শিল্পীর, তার পয়মন্তর পেনসিল আরো জোরে জোরে চলে।

চলো তো যাই ওর কাছে, চুপি চুপি, আঁকায় ব্যাঘাত না করে।

আরে, ছবি যে আমাদেরই নায়কদের নিয়ে! তবে তখন তারা আর এমন ছোটোটি নয়, একেবারে সাবালক হয়ে উঠেছে। মহাকাশের দূর যাত্রায় যাচ্ছে ব্যোমনাবিক বরকা স্মেলভ। ভয়ানক সমারোহ! কিন্তু বরকার বুড়ি-হয়ে-পড়া মা আর শোকাকুল ল্যুবকা চোখের জল চেপে রাখতে পারছে না ... কিন্তু গেনা কারাতভ কোথায়? আরে ঐতো — ইলিউমিনেটরের গবাক্ষ থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে। বৈজ্ঞানিক সে, তর আর তার সয়নি, ফ্লাইংস্যুট পরে বন্ধুকে হাত নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে।

মহাজাগতিক যুগ যখন অবারিত হয়ে উঠবে, তখন অনেক উঁচুতে উঠে যাবে টেকনিক, রবিবার রবিবার লোকে তখন পিকনিক করতে যাবে ধ্রুব তারায় ...

আমাদের পরিব্রাজকেরা তো মর্ত্য জীব, তাই নির্ঘাৎ আবার বাড়ি ফিরে আসবে বৈকি ...

কিন্তু বাকিটা আর দেখা গেল না। শিল্পী তার অ্যালবামটি বন্ধ করে দিলে। স্কেচগুলোতে সে রঙ দেবে বাড়িতে, তারপর চমৎকার এক উপহার দেবে তার ছোটো বন্ধুদের।

আর পাঠক, যদি কোনো দিন গাছপালায় ঢাকা একটা পুরনো একটেরে বাড়ির কাছ দিয়ে কখনো যাও, তাহলে আমাদের চারপেয়ে বীরদের দেখতে পারো। দেখবে আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কতকগুলো কুকুর, তাদের মধ্যে দেখলেই চেনা যাবে, লাস্যময়ী গুবরেকে, হরিহর আত্মা বেলকা আর স্ত্রেলকাকে, আলসে, হাই তোলা পামকে। আর ঐ বেয়াড়া আনাড়ী দুষ্টুগুলো কে বলো দেখি, যারা কাউকে দেখলেই একসঙ্গে সবকটি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারপর মুখের মতো জবাব পেয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে ছুটে আসছে কালো কানওয়ালা স্ত্রেলকার দিকে? হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুশি এই ছয়টি জীব হল স্ত্রেলকার ছেলেমেয়ে। ইনস্টিটিউট যারা দেখতে আসে, তাদের এই বাচ্চাগুলোকে দেখানো হয়। ডাক্তারেরা বলে, 'মহাকাশ থেকে ওদের মা ফিরে আসার পর জন্মেছে এগুলো। তার মানে মহাজাগতিক বিকিরণ তেমন ভয়ের কিছু নয়। চেয়ে দেখুন, কেমন সব পালোয়ান!'

আর অবশ্যই আঙিনায় আরো একটি কুকুর চোখ টানবে তোমাদের — শান্তশিষ্ট শাদা এই কুকুরটা কিন্তু ঠিক সময়েই নিরস্ত করে বাচ্চাগুলোকে, সাধারণ শৃঙ্খলার ওপর চোখ রাখে। এটি বেপরোয়া। ভেব না ওটা ওর গুমর। আসলে ও তো আর এখন ছোটোটি নয়, বয়স হয়েছে, ভারিক্কী হয়েছে, তার মধ্যে এক কর্মীর মর্যাদা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু যেই রেলিঙের কাছে বরকা এসে দাঁড়ায়, তখন দেখো একবার এই ধীরস্থির ভারিক্কী মহাকাশযাত্রীটিকে! একেবারে চার পা তুলে ছুট দেয় বেপরোয়া, হঠাৎ হয়ে ওঠে সেই সোহাগী, আদুরে তিয়াপা।

'মানে, বলছিলাম কী,' দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করে বরকা, 'আমার বেপরোয়া শিগগিরই আবার মহাকাশে যাবে নাকি ?'

'আরে ছোঁড়া, খুব যে তুখোড় হয়েছিস দেখছি, সবই ওঁর জানা চাই!' প্রত্যেকবারই কেমন অবাক হয় দরোয়ান, তারপর দরদের সুরে বলে, 'শিগগিরই যাবে। শুনেছি তৈরি করছে, মানে ট্রেনিং দিচ্ছে আর কি। তাহলেও সঠিক কী আর বলা যায়? হঠাৎ একদিন রেডিওয় শুনবি, তখন সবই জানতে পারবি।'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

মস্কোর বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় থেকে বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে:

পাভেল বাজোভ

রুপালী খুর

ককভানিয়া বুড়ো ও তার পোষ্যকন্যা দারিয়ঙ্কা থাকে গহন বনে; কী করে তারা রুপালী খুরের একটি ছাগলছানা দেখে তা নিয়ে উরালের একটি লোককাহিনী এটি। যেখানেই মাটি ছোঁয় রুপালী খুর সেখানেই পাওয়া যায় মূল্যবান সবুজ পাথর — ক্রিসোলাইট॥

সের্গেই বারুজদিন

রবি ও শশী

সোভিয়েত শিশুদের যে দুটি বাচ্চা হাতী শ্রীনেহরু উপহার দেন তাদের গল্প।

জলের চিড়িয়াখানা বিশেষ 'সেভাস্তপল' জাহাজে চেপে ভারত থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে আসে রবি ও শশী, যাত্রাটি বেশ মজার। এরিমধ্যে রবি ও শশীর সঙ্গে চেনা পরিচয় ও মিতালি হয়ে গিয়েছে সোভিয়েত শিশুদের॥

ভিতালি বিআংকি

হঠাৎ দেখা

নবীন প্রকৃতি অনুরাগীদের বইটি উৎসর্গ করেছেন লেখক। বর্ণনা করেছেন সুদক্ষ প্রবীণ শিকারীদের এবং কিশোর প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের নানা এ্যাডভেঞ্চার। শিকারী ও আবিষ্কারকদের পথে যে সব দুর্গম বাধা ও বিপত্তি তাদের অতিক্রমণে বিআংকির ছেলেমেয়েরা সাহায্য পায় প্রকৃতির বিষয়ে নিজেদের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ শক্তি থেকে, প্রকৃতিবিজ্ঞানীর যে সাহস না থাকলে নয় তা এবং প্রাকৃতিক নিয়মবিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা থেকে॥

আর্কাদি গাইদার

নীল পেয়ালা

শিশুদের জন্য ১৯৩৬-এ আর্কাদি গাইদার-এর (১৯০৪-১৯৪১) লেখা বইটিতে দেখানো হয়েছে কী করে ছোট্ট মেয়ে স্ভেতলানা তার চারিপাশের দুনিয়াকে জানার চেষ্টা করে॥

আর্কাদি গাইদার

চুক আর গেক

চুক ও গেক দুই ভাই মায়ের সঙ্গে গেল দূর প্রাচ্যে, সেখানে তাইগা বনে কাজ করে তাদের বাবা। দুই ভাই-এর জীবন্ত ছবি এঁকেছেন গাইদার, সূক্ষ্ম ও দরদী কৌতুকভরে বর্ণনা করেছেন তাদের নানা দুষ্টুমি ও এ্যাডভেঞ্চার।

ছবি এঁকেছেন দুবিনস্কি॥

ভালেন্তিন কাতায়েভ

অমলধবল পাল

১৯০৫ সালের ঘটনাবলী বর্ণনা করে ভালেন্তিন কাতায়েভ বিপ্লবী ওদেসা এবং 'পতিওমকিন' যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকদের বিদ্রোহের কথা বলেন।

বইটির নায়ক দুটি ছেলে — জেলের নাতি গাভ্রিক ও তার বন্ধু স্কুল-মাষ্টারের ছেলে পেতিয়া॥

আলেক্সান্দ্র কোনোনভ

সোকোলনিকিতে নববর্ষ

মস্কো সহরের সোকোলনিকি জেলার একটি অনাথাগারে শিশুদের জন্য ১৯১৯-এর নববর্ষের অনুষ্ঠানে আসেন লেনিন, সঙ্গে তিনি এনেছিলেন শিশুদের জন্য উপহার, তাদের সঙ্গে তিনি বিড়াল-ইঁদুর খেলা ও কানামাছি খেলেন। ছোট্ট কাতিয়া বলে লেনিনকে, 'লেনিন, তুমি চলে যেও না! আমাদের কাছে সব সময় থেকো।'

ফড়িং আর পিঁপড়ে॥ জর্জিয়ার লোক কাহিনী।

একসঙ্গে যাত্রা করে ফড়িং আর পিঁপড়ে। বেচারি পিঁপড়ে একটা ছোট্ট নদীতে পড়ে কিন্তু সময়মত তাকে বাঁচায় তার বিশ্বস্ত বন্ধু ফড়িং। একেবারে ক্ষুদেদের জন্য এই কাহিনীকে ছবিতে সমৃদ্ধ করেছেন গ্রিগরি ফিলপ্পভ্স্কি॥

নিকলাই নোসভ

আমুদে পরিবার

মিশ্‌কা ও কোলিয়া ডিমে তা দেবার যন্ত্রের সাহায্যে হৃষ্টপুষ্ট হলদে মুরগীছানার গোটা একটা আমুদে পরিবার গড়ে তোলে একেবারে নিজেদের চেষ্টায়; অবশ্য নিজের পুতুলের কাপ দেয় মিশার ছোট বোন মায়া, সেটা ব্যবহার করা হল ডিমে তা দেবার জন্য। নিকলাই নোসভের গল্পগুলি একাধারে মজার ও শিক্ষামূলক। বাচ্চা পাঠকরা গল্পগুলির মাধ্যমে গিয়ে পড়ে বিরাট একটি জগতে, রহস্যের ছড়াছড়ি হলেও সে জগত সহজ ও যুক্তিসঙ্গত, সেখানে নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারে সবাই॥

শাদা কালো গা হাঁড়ি-চাঁচা

ক্ষুদেদের জন্য রাশিয়ার লৌকিক খেলার ছড়া। শাদা কালো গা হাঁড়ি-চাঁচা অতিথিদের চড়ুইভাতির নিমন্ত্রণ করে সবাইকে খাওয়াল কিন্তু একজনা কিছু পেল না। তার কারণ —

কাঠ সে কাটেনি,
জল সে ভরেনি,
ধরায়নি উনান,
রান্না করেনি ...

রঙের ছবি এঁকেছেন ইউ. ভাস্‌নেৎসভ॥

ইয়াকভ তাইৎস

গুটির ওপর গুটি

সবে হাঁটতে শেখা বাচ্চাদের জন্য সচিত্র ছোট্ট গল্পের সমষ্টি। কাঠের কুঁদো থেকে বাচ্চারা কেমন করে নানা ধরনের জন্তু, যেমন সিংহ, উট ও বিড়াল বানালো তার কথা বলা হয়েছে একটি গল্পে। আর একটি থেকে জানা যায় কেমন করে একই পেন্সিলে মিশা আঁকল নীল ছবি আর মাশা আঁকল লাল ছবি। বই থেকে এ সব অন্যান্য অনেক মজার বিষয়ে শিক্ষা পাবে শিশুরা॥

গুবরে
লাইকা
বেপরোয়া
বেলকা আর স্ত্রেলকা
কেলে আর তারকা